ফুটবলের কলাকৌশল

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ

বাংলা একাডেমীর **মুদ্রণ শাখা**

ভূমিকা

৩০এ, তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৫
১৫।৬।৫৮

ইংরেজরা যত খেলা এদেশে এনেছে তার ভেতর বাঙ্গালীরা এই ফুটবল খেলাতেই সবচেয়ে পারদর্শী ছিল। এমন কি ফুটবল বলতে বাংলা ও বাঙ্গালীকেই বোঝাতো।

এদেশে এরূপ পুস্তক অনেকদিন আগেই লেখা উচিত ছিল। কেননা এখন যেহেতু আর ভগবানদত্ত খেলোয়াড় নেই, খেলা শিখেই খেলোয়াড় হতে হবে, তখন খেলা শেখার কোন ভাল বই না থাকলে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা শক্ত। তাই আজকের দিনে এই রাশিয়ান ফুটবল শিক্ষার বইয়ের বাংলা অনুবাদ খুবই সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়। কামনা করি প্রকাশক-দের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হোক।

শ্রীগোষ্ঠ পাল

গত ১০০ শত বৎসর ধরে ফুটবল গতানুগতিকভাবেই চলে আসছে, বর্তমানে ফুটবল একটা জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফুটবল বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ভারতের বিশেষত বাংলা দেশের জীবনে ফুটবল একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি ফুটবল অনুরাগী দেশ সুসংবদ্ধ নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ফুটবল খেলার তত্ত্বগত শিক্ষা ও অনুশীলনে বদ্ধপরিকর। প্রত্যেক সমৃদ্ধশালী দেশেই ফুটবল খেলার শিক্ষা পদ্ধতি নিজ

নিজ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে, যার মাধ্যমে একই পদ্ধতিতে সারা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে ফুটবল খেলার শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে কোন পুস্তক রচনা হয়নি। এই সমস্ত পর্যালোচনা করে এবং কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রীড়ার মান উন্নততর করার প্রয়োজন বোধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতীয় ফুটবল দলের ক্রীড়াপদ্ধতির পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার জন্য আমি প্রকাশকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

এই পুস্তকখানির মাধ্যমে পাওয়া যাবে ফুটবলের তত্ত্বগত শিক্ষা ব্যবস্থা, মূল কলা-কৌশল, শিক্ষা পদ্ধতি ও তার অনুশীলন এবং আপাতত শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মসূচী। আশা করি বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদগণ এই পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ফুটবল খেলার কলা-কৌশল আয়ত্তে এনে দেশের ক্রীড়ারত ছোট ছেলেদের থেকে আরম্ভ করে জাতীয় প্রতিনিধিত্বে উপযুক্ত খেলোয়াড়দের পর্যন্ত তত্ত্বগত শিক্ষা ও প্রকৃত অনুশীলনে কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন

শ্রীবীরেন ঘোষ

—প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ্ ও এরিয়ান

ক্লাবের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন।

সূচী

ফুটবল খেলোয়াড়দের তত্ত্বগত শিক্ষা

ফুটবল খেলোয়াড়দের তত্ত্বগত শিক্ষার লক্ষ্য হল ফুটবল খেলা সম্পর্কে তাদের মোটামুটি ও বিশেষ জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা। এর মধ্যে পড়ে শরীরচর্চার সাধারণ শিক্ষা ও খেলা অনুশীলনের নানা পদ্ধতি, খেলায় পারদর্শিতা ও কৌশল অর্জনের উপায়, খেলার নিয়ম-কানুন শেখা ও শেখানোর নীতি এবং শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে খানিকটা ধারণা।

তত্ত্বগত শিক্ষার বেশি করে প্রয়োজন হয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত খেলার মানকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্য। তাছাড়া এর ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতে শিক্ষাদাতা বা 'কোচ' হিসেবেও বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠতে পারেন।

তত্ত্বগত শিক্ষার মধ্যে পড়ে বক্তৃতা, আলোচনা, খেলার নানা বিবরণ শোনা এবং এ সম্পর্কে বিশেষ পড়াশোনা।

খেলোয়াড়দের নিজেদেরও দরকার মতো বলতে কইতে দেওয়া উচিত; কারণ, এতে তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান আরো গভীর হয়ে উঠবে। আলোচনা নানা প্রসঙ্গের হতে পারে, যেমন "সেণ্টার ফরোয়ার্ডের কৌশল", "সোজাসুজি কিক্ করার কায়দা", "ফুটবল খেলোয়াড়দের শরীরচর্চা" ইত্যাদি। দলের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের লক্ষ্যভুক্ত বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট দিকগুলো আলোচনার মধ্যে আনা দরকার।

যে সব খেলোয়াড়েরা বক্তৃতা করেন তাঁদের খেলার সম্পর্কে বইপত্র, খেলার প্রতিযোগিতার ফলাফল ও নিজেদের দলের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর নজর থাকা দরকার।

খেলার বিরতি মরশুমকে (অফ-সিজন্) তত্ত্বগত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাতে হবে, কারণ, খেলার মরশুমে বক্তৃতাদির জন্য আর একটুও সময় পাওয়া যাবে না।

বিরতি মরশুমের অবকাশেই বক্তৃতা ও রিপোর্ট শেষ হওয়া চাই। কারণ তা না হলে খেলার মরশুমে এসব করতে গেলে খেলোয়াড়েরা ক্লান্তির জন্য এসব বক্তৃতা থেকে তেমন লাভবান হবে না।

পাঠ্যবিষয়গুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া চাই। ফুটবল খেলার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত পাঠ শীতকালের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেতে পারে। শিক্ষাকালের মধ্যে খেলোয়াড়রা খেলার কৌশল, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়ই নানা প্রশ্ন করবেন, তত্ত্বগত দিক থেকে এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা দরকার। হাতে কলমে শেখার সময়ে তত্ত্বগত শিক্ষার ব্যাপারগুলি নিয়ে বেশি সময় ব্যয় করা উচিত নয়।

তত্ত্বগত শিক্ষা ও মাঠে নেমে খেলা—এ দুয়ের সমন্বয় খেলোয়াড়দের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে এবং খেলায় কুশলতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

খেলার মরশুমে আসল খেলার দিকেই ও তার আশু প্রস্তুতির জন্যই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। এ সময়ে পূর্বেকার বিভিন্ন খেলার ফলাফল বিশ্লেষণ ও আগামী দিনের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পরামর্শদানের মধ্যেই তত্ত্বগত শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

ভালোভাবে খেলার পরিকল্পনা করতে হলে শিক্ষককে তাঁর নিজের দলের ও বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতার কায়দা ও কৌশল বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে স্থির করা উচিত।

কোনো খেলার প্রস্তুতির সময়ে শিক্ষাদাতা বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বিষয়ে যা কিছু জানেন তাঁর দলীয় খেলোয়াড়দের বলবেন ও তাঁর নিজস্ব কৌশলের কথা উপস্থিত করবেন। যেমন বিপক্ষ যদি কোণঠাসা করে শর্টপাস্ করে খেলে তবে তাদের বাধা দেবার সব থেকে ভালো উপায় হল লম্বালম্বি কোনাকুনি পাস্ করে তাদের সঙ্গে সোজাসুজি খেলা চালিয়ে যাওয়া।

শিক্ষাদাতা প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আলাদা-আলাদা ভাবে ও গোটা দল মিলিয়ে সকলকে নির্দেশ দেবেন।

শিক্ষাদাতা বিপক্ষকে বাধা দেবার জন্য অন্যান্য বিকল্প কৌশলেরও নির্দেশ দেবেন, যাতে তারা প্রয়োজনমত তাদের কলাকৌশল বদলাতে পারে।

এদিক থেকে মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে:

১। খেলাটির গুরুত্ব ২। বিপক্ষদল। ৩। নিজের দলের জন্য কৌশল নির্ধারণ। ৪। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শদান।

খেলার বিষয়ে পরামর্শগুলি সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট বিষয় মাফিক হওয়া দরকার। বেশি খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কৌশলগত পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্যই অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং খেলার উত্তেজনার মধ্যে খেলোয়াড়দের সে-সব ছোট ছোট খুঁটিনাটি দিক মনে না থাকাই সম্ভব। ফলে খেলা শেষ হবে কোন রকম পরিকল্পনার ধার না ধরেই।

বিপক্ষ সম্পর্কে ধারণার উপর ভিত্তি করে মোটামুটিভাবে পরিকল্পনা উপস্থিত করা উচিত, যাতে ম্যাচখেলার সময়ে খেলোয়াড়রা স্বতন্ত্রভাবেই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খেলার আগের দিন কিংবা তা সম্ভব না হলে অন্তত খেলার ত্রিশ মিনিট আগে একবার বিশেষভাবে তত্ত্ব ব্যাপারে তালিম দেবার সময় এই সব পরামর্শ দেওয়া উচিত।

শিক্ষাদাতা মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখবেন এবং হাফ টাইমের সময়ে টিমের কায়দা-কৌশলের দিকগুলোকে দরকার মতো সংশোধন করে দেবেন।

হাফ টাইমের সময়ে দশ মিনিট অবকাশ থাকার নিয়ম। তখন নির্দেশ দেবার আগে শিক্ষাদাতা খেলোয়াড়দের দুই-তিন মিনিট দম ফিরে পেতে সময় দেবেন। পরের দু-তিন মিনিটে দলের খেলার বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য এবং খেলার উন্নতির জন্য নানা পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অল্প দূরত্বে বল পাস্ করা থেকে বেশি দূরে ও আড়াআড়িভাবে পাস্ করা: কিংবা কোনো আক্রমণ ব্যর্থ হলে ফরোয়ার্ড খেলোয়াড়দের তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসা। বাকি সময় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশাদি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

খেলার বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য ও নতুন নির্দেশ দেবার আগে শিক্ষাদাতা খেলোয়াড়দের এমনভাবে দাঁড় করাবেন যাতে তারা সহজেই মনোযোগ দিতে পারে ও বিশ্রামের সুযোগ পায়। শিক্ষাদাতা শান্তভাবে কথাবার্তা বলবেন।

খেলোয়াড়দের প্রতি শিক্ষাদাতার নির্দেশ দানের ভাবভঙ্গি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খেলার প্রথমার্ধে অকৃতকার্যতার পর হাসিখুশি ও আত্মবিশ্বাসের

সঙ্গে কথা বললে দলকে আরো কঠিন সংগ্রামে উৎসাহিত করা যাবে, কিন্তু দল যখন জয়ের জন্য কঠিনভাবে লড়াই করছে অথচ অবস্থা তার অনুকূলে আসেনি তখন তাকে রূঢ় ভৎর্সনা করলে খেলোয়াড়দের উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষাদাতা যদি যত্নসহকারে দলের ও বিভিন্ন খেলোয়াড়দের মনোভাব যাচাই করে দেখেন এবং বাস্তব দৃষ্টিতে অবস্থাটা বুঝে নেন তা হলে তিনি এগোবার সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন। শিক্ষাদাতা হবেন আত্মস্থ প্রকৃতির লোক। ক্রোধকে তিনি একটুও প্রশ্রয় দেবেন না, কারণ রাগের দ্বারা কোনো সুকাজ হয় না। এক খেলোয়াড়ের বদলে আর একজন খেলোয়াড়কে নিয়োগের ব্যাপারে ও প্রতিটি খেলোয়াড়ের খেলা ও যোগ্যতা বিচার করবার সময় এ জিনিস বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে।

দলের খেলার হিসাব-নিকাশে শিক্ষাদাতার সুচারু ও বাস্তব-দৃষ্টি খেলার দ্বিতীয়ার্ধে খেলার মান উন্নত করে তুলতে সাহায্য করবে।

খেলা শেষ হলে খেলার সাধারণ হিসাব-নিকাশ ও খেলা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণাটুকুর উপর ভিত্তি করেই খেলার পর্যালোচনা শুরু হওয়া উচিত। দল তার পরিকল্পিত কৌশলগুলি শুধরে নিয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে পরে মন্তব্য করা উচিত। যদি তা না শুধরে থাকে তবে কোন্ বাধার জন্য পারেনি তা দেখতে হবে। খেলায় যাতে পরে উন্নতি হয় সে দিকে তাকিয়েই শিক্ষাদাতা ভুলভ্রান্তিগুলির পর্যালোচনা করবেন।

এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ মোটামুটি নিম্নোক্ত কায়দায় হবে: (১) খেলার সাধারণ পর্যালোচনা। (২ পরিকল্পিত কৌশলগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। (৩) বিভিন্ন খেলোয়াড়ের খেলার দোষগুণ। (৪) খেলার মোটামুটি হিসাব-নিকাশ।

এর পর যখন হাতে কলমে তালিম নেওয়া হবে তার আগে বিচার-বিশ্লেষণগুলি হাজির করা উচিত। শিক্ষাদাতা তত্ত্বগত শিক্ষাকালে খেলার কায়দা কৌশল সম্পর্কে খেলোয়াড়দের নতুন-নতুন তথ্য জানাবেন। খেলোয়াড়দের তরফ থেকে কোনো রকম অশিষ্ট আচরণ ঘটলে (যেমন রূঢ় ব্যবহার, ভীরু আচরণ, সঙ্গী খেলোয়াড়দের প্রতি বা রেফারির প্রতি বা দর্শকদের প্রতি অনুপযুক্ত ব্যবহার) বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে তার সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করা দরকার।

খেলার প্রতি খেলোয়াড়ের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলবার জন্য টিমের অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের ও অন্যান্য দলের সভ্যদের দর্শক হিসাবে হাজির রাখা উচিত যাতে তারা ম্যাচখেলা ও খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়া-পদ্ধতি লক্ষ্য করে। খেলার পর তাহলে তারা দলের ও বিভিন্ন সভ্যের খেলা সম্পর্কে মতামত দিতে পারবে। এতে খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নত হবে ও খেলার তত্ত্বগত দিকে তারা সুদক্ষ হয়ে উঠতে পারবে।

খেলা সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও পরামর্শাদি দেবার সময়ে ফুটবল খেলার মাঠের একটি মডেল ব্যবহার করা উচিত। এতে খেলার সময়কার কৌশল-প্রয়োগের নানা ধরনের পরিস্থিতি, টিম-ওয়ার্ক ইত্যাদি চাক্ষুষভাবে দেখানো সম্ভব হবে।

খেলার মরশুমে খেলার উত্তেজনার পর যাতে ধীরে ধীরে খেলোয়াড় অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেন তার জন্য বিরতি মরশুমে অন্যান্য খেলাধূলার আয়োজনের ব্যবস্থাও তত্ত্বগত শিক্ষার মধ্যে থাকা দরকার।

খেলোয়াড় হিসেবে পাকাপোক্ত থাকার জন্য খাটুনি ও বিশ্রাম কিভাবে একসঙ্গে মেলাতে পারা যায় খেলোয়াড়দের তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

খেলা বিষয়ক সিনেমা ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতাগুলি দেওয়া সঙ্গত।

শিক্ষাদাতা শিক্ষাদানের তত্ত্ব, শিক্ষণ-বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব ও শরীরচর্চার তত্ত্বগত দিক ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটানা পড়াশোনা করবেন। তিনি এসব বিষয়ে সর্বসাম্প্রতিক প্রকাশিত বইপত্র পাঠ করবেন ও তাঁর ছাত্রদের পাঠ করতে বলবেন।

ফুটবল খেলার মূল কলাকৌশল

ফুটবল খেলার আসল জিনিস নানাভাবে বল মারবার কায়দাকানুন। খেলার মূল কৌশলের মধ্যেই বিষয়টি পড়ে। ভালো খেলোয়াড় হতে গেলে এ কৌশল রপ্ত না করলেই নয়।

ফুটবল খেলার কৌশল ক্রমাগত উন্নত হয়ে উঠছে; তাই খেলোয়াড়দের পটুতা অর্জন করা ও নিখুঁত হয়ে ওঠা এখন অপরিহার্য। ফুটবল খেলার কলাকৌশলে খেলোয়াড়দের দক্ষ ও নিপুণ করে তোলা ট্রেনিংয়ের একটি প্রধান অঙ্গ।

ফুটবল খেলার মূল ক'টি ব্যাপার হল: (১) বল কিক্ করা; (২) বল পাকড়ানো; (৩) বল আয়ত্তে রাখা; (৪) বিপক্ষকে ছল-চাতুরী দিয়ে কাবু করা; (৫) বল কাড়াকাড়ি করা; (৬) বল ছোঁড়া বা থ্রো করা; (৭) গোল রক্ষা করা।

বল কিক্ করার পদ্ধতি

একটা বিশেষ গতিতে একটা বিশেষ দিকে পায়ের পাতার কোনো অংশ দিয়ে বল ঠেলে দেওয়াকে 'কিক্' করা বলে।

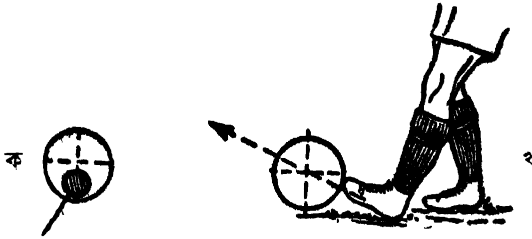
কিক্ সোজা হতে পারে, আবার ট্যারচা (স্লাইস্‌ড্) হতে পারে। সোজা কিক্ করলে বল ঘোরে না, ট্যারচা কিকে বল ঘোরে।

সিধে কিক্ করতে গেলে বলের ঠিক মাঝখানে মারতে হবে। "স্লাইস্‌ড্" কিক্ করতে গেলে বলের এক পাশে নিচু দিকে মারতে হবে, যাতে আপন অক্ষের উপর ঘোরে। বল সামনের দিকে ঘুরতে ঘুরতে যায়।

বল যখন থেমে থাকে তখনও কিক্ করা হতে পারে। শূন্যের উপর দিয়ে খেলোয়াড়ের দিকে উড়ে আসার সময়, খেলোয়াড়ের পাশে বা পেছনে এলেও কিক্ করা হয়।

একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বল বসিয়ে সেখান থেকেও খেলোয়াড় কিক্ করেন, অথবা খেলোয়াড় ছুটন্ত অবস্থায় বা লাফিয়েও কিক্ করেন।

ডিরেক্ট বা সোজা কিক্ করা—নিচের উপায়গুলিতে বল ডিরেক্ট কিক্ করা হয়: (ক) পায়ের (বুটের) ডগা দিয়ে; (খ) পায়ের পাতার ভিতরের পাশ দিয়ে; (গ) পায়ের পাতার বাইরের পাশ দিয়ে; (ঘ) পায়ের পাতার পিঠের দিক (ওপর দিক) দিয়ে, ইত্যাদি। সিধে (ডিরেক্ট) কিক্ করতে গেলে পায়ের যেদিক দিয়ে বল মারতে হবে সে দিকটি বলের গতিপথের দিকে ঠিক লম্বভাবে (অর্থাৎ সমকোণে) রাখা চাই।



চিত্র ১॥ পায়ের ডগা দিয়ে কিক্ করা। পায়ের সঙ্গে বলের সংযোগ: (ক) সামনের দৃশ্য; (খ) পাশের দৃশ্য।

ঠিকভাবে বল মারতে হলে যে পা-খানি দিয়ে বল মারা হবে না, সেখানি যতদূর সম্ভব বলের কাছাকাছি রাখা চাই। কিকের সময় এটা যেন একটা খুঁটির কাজ করে। দাঁড়ানো পা-খানির সাহায্যে যে-পা দিয়ে কিক্ করতে হবে সেই পায়ের উরু সামনের দিকে এগিয়ে দিতে হবে এবং কোমর থাকবে স্থির অনড় অবস্থায়।

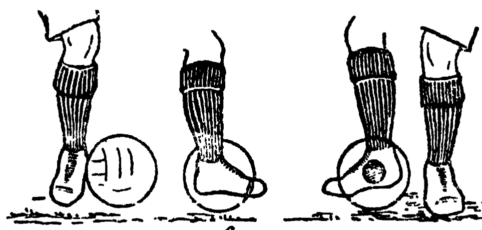
এখন এক-জায়গায় বসিয়ে কিভাবে বল সিধে কিক্ করা হয় দেখা যাক।

বুটের মাথার দিক (ডগা) দিয়ে কিক্ করা—বুটের মাথার দিক দিয়ে ঠিকভাবে কিক্ করতে গেলে খেলোয়াড় যে-পা দিয়ে কিক্ করতে হবে সে পাটি বেশ জোর দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে হাঁটুর সন্ধিটি টান-টান করে পায়ের ডগার দিক দিয়ে বল মারবেন। বলে পা লাগবার সময়টিতে পায়ের পাতার গাঁট (অ্যাঙ্কল) এবং হাঁটুর সন্ধি শক্ত করে রাখতে হবে এবং দাঁড়ানো পা-টি হাঁটুর কাছে সামান্য ভাঁজ করা থাকবে। যে পা দিয়ে কিক্ করতে হবে তা ক্রমে সামনের দিকে এগোবে ও উঁচুতে উঠবে। সে

সময়ে ওই দিকের হাতটি পেছন দিকে সরে আসবে ও অপরদিকের বাহুখানি সজোরে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে। খেলোয়াড়ের দেহ সামনে অল্প ঝুঁকে অথবা খাড়া হয়ে থাকবে।

বল কতটা উঁচু দিয়ে কোন্ দিকে উড়ে যাবে তা নির্ভর করবে বলের সঙ্গে পায়ের কোন্ নির্দিষ্ট জায়গাটিতে স্পর্শ হচ্ছে তার ওপর। দূরে পাঠাতে গেলে বলের ভূমি-সমান্তরাল অক্ষের (পেটের) একটু নিচুতে মারতে হবে (চিত্র ১)। গোলে কিক্ করা, কর্নার কিক্ করা অথবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ফ্রি কিক্ করা এবং কখনো-সখনো পেনাল্টি কিকেও এই ধরনের কিক্ চলে। বল গড়াতে গড়াতে এলে পায়ের ডগা দিয়ে সাধারণত কিক্ করা হয় না, তবে খেলোয়াড়ের দিক থেকে গড়িয়ে চলে যাবার সময় তা করা চলে। বল উঁচু দিয়ে এলেও কদাচিৎ পায়ের ডগা দিয়ে কিক্ করা হয়ে থাকে।

পায়ের পাতার ভিতরের পাশ দিয়ে কিক্ করা—বল স্থিরভাবে রেখে পায়ের পাতার ভিতরের দিক দিয়ে কিক্ করতে গেলে তার ফলাফল নির্ভর করে হাঁটুর সন্ধির ওপর। এ সময়ে দাঁড়ানো পাটি হাঁটুর কাছে অল্প ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে আর যে-পা দিয়ে কিক্ করতে হবে তার হাঁটু বাইরের দিকে ঘোরানো থাকবে। পায়ের পাতার ভিতরের দিকের সবখানিই বল মারতে লাগে।



চিত্র ২ ॥ পায়ের পাতার ভেতর পাশ দিয়ে কিক্ করা। পায়ের সঙ্গে বলের সংযোগ: (ক) পাশের দৃশ্য; (খ) পেছনের দৃশ্য, পায়ের পেছনে বল; (গ) সামনের দৃশ্য, পা বলের পেছনে।

এভাবে কিক্ করতে গেলে কিক্ করবার পা-খানি খুব বেশি উঁচিয়ে নেওয়া হয় না। বলের গায়ে পা টেনে এনে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় স্পর্শ

করে রাখতে হয় (পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে বা ইন্‌স্টেপ কিকের তুলনায় বেশি সময়)। পায়ের পাতার গাঁট এ সময়ে শক্ত করা থাকে। দেহ সাধারণত অল্প পিছনে হেলানো থাকে। যে পা দিয়ে কিক্ করা হয় তার বিপরীত দিকের কাঁধ সামনে এগোনো থাকে, বাহু থাকে তার স্বাভাবিক সুবিধামতো।



চিত্র ৩॥ পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক করা। দাঁড়ানো পায়ের অবস্থান ও কিক্ করার পা-খানি তুলিয়ে নেওয়া।



চিত্র ৪॥ বল বরাবর পা বাড়িয়ে দেওয়া (ফলো থ্রু)



চিত্র ৫ পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করার সময় দাঁড়ানো পায়ের অবস্থান ও বলের সঙ্গে পায়ের সংযোগ।

কাছাকাছি বল পাস করবার সময়ে ও গোল দেবার সময়ে এই ধরনের কিক্ করা হয়। এই ধরনের কিকে নিশানা হয় নিভুর্ল, তাই বল যখন গড়াতে গড়াতে আসে বা মাথার ওপর দিয়ে আসে তখনও এভাবে কিক্ করা হয়।

পায়ের পাতার বাইরের পাশ দিয়ে কিক্ করা—এভাবে কিক্ করতে গেলে যে পা দিয়ে কিক্ করতে হবে সে পায়ের বুটের ডগা ভিতর দিকে ঘোরানো থাকে আর বাইরের দিক দিয়ে বল মারা হয়। এভাবে কিক্ করতে গেলে যদিও পা একটু অসুবিধার মধ্যে থাকে তবু খেলায় এ ধরনের কিকের ব্যবহার আছে।

পায়ের পাতার পিঠ (ওপর) দিয়ে কিক্ করা—পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করতে গেলে হাঁটুর সন্ধির ওপরই প্রায় সবটা নির্ভর করে।

দাঁড়ানো পা-খানা বলের যত কাছে সম্ভব রাখতে হয় (চিত্র ৩)। যে পা দিয়ে কিক্ করতে হবে সেখানি সজোরে পিছনে টেনে নিয়ে মারতে হয়। বল মারার সময়ে পায়ের ডগার দিকটা শক্ত করে বাড়িয়ে ধরতে হয়। যে পা দিয়ে কিক্ করা হবে তার হাঁটু বলের উপর দিকে থাকে। শরীর সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে থাকে। কিক্ করবার পা-খানি মারার পর বল বরাবর এগিয়ে যায় [ফলো থ্রু] (চিত্র ৪)। যে পা দিয়ে কিক্ করা হয় তার বিপরীত দিকের বাহু সামনের দিকে ও অপর বাহুখানি পিছনের দিকে চলে যায়।

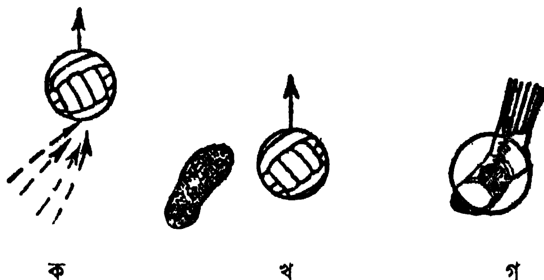
"শর্ট কিকের" কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। এর মানে এতে হাঁটু পুরো ভাঁজ হয় না। আসলে এই কিক্ করা হয় পুরোপুরি হাঁটুর সন্ধির সাহায্যেই। হাঁটুকে পুরো বাঁকিয়ে ও বাড়িয়ে দিয়ে ভালো করে কিক্ করতে গেলে পা "পুরোদস্তুর" তুলিয়ে নিয়েই মারতে হয়। যাঁরা নতুন খেলা শিখছেন তাদের যতটা বেশি সম্ভব পা তুলিয়ে নিয়েই মারা অভ্যাস করা উচিত। হাঁটু কিভাবে ছিল তার উপরই বল কেমন ছুটবে না ছুটবে তা নির্ভর করে।

যদি হাঁটু সামনের দিকে বলের উপর ঝুঁকে থাকে ও পায়ের পাতার পিঠ টান-টান থাকে তবে বলে পা লাগাবার সময়ে পায়ের পাতার যে অংশটা বল ছুঁয়েছে তা খাড়া অবস্থায় থাকবে ও ছুটে যাবার সময়ে বল অল্প একটু বেঁকে যাবে। আরো বেশি বক্র গতিতে বল পাঠাতে হলে হাঁটু বলের কিছু পিছনে রাখা চাই, বলেব ঠিক উপবে রাখলে চলবে না। দাঁড়ানো পা-খানি বলের একটু পিছন দিকে শক্তভাবে রাখলেই এভাবে বল মারার সবচেয়ে সুবিধা।

বল যখন থেমে থাকে, যখন গড়াতে থাকে, মাটি ছেড়ে উপরে ওঠে, তখন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থেকে বা ছুটন্ত অবস্থায় ইনস্টেপ্ কিক্ (পায়ের পাতাব পিঠ দিয়ে) করতে পাবেন। গোল করা, ফ্রি কিক্ করা, কর্নার কিক্ করা অথবা বল পাস্ করতে গেলে এভাবে বল কিক্ করা চলে।

পাযেব পাতার পিঠেব (ইনস্টেপের) ভিতর দিক দিয়ে কিক্ করবার সময়ে পাযেব পাতা বাইবের দিকে খানিকটা বেরিয়ে আসে (চিত্র ৬)। ফ্রি বা কর্নার কিক্ করা, বল পাস্ করা এবং বিশেষ করে দূরে মেরে দেওয়ার জন্য এই ধরনের কিক্ করা যেতে পারে।

পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করার সময়ে পায়ের পাতা ভিতর দিকে অর্থাৎ দাঁড়ানো পায়ের দিকে অল্প টেনে নেওয়া হয়।



চিত্র ৬॥ পায়ের পাতার পিঠের ভেতর দিক দিয়ে কিক্ করা: (ক) কোন্ কোন্ দিক থেকে মারা যেতে পাবে; (খ) দাঁড়ানো পায়ের অবস্থান; (গ) পায়ের সঙ্গে সংযোগ কোথায় ঘটবে।

পায়ের পাতা বলে ঠেকবার সময়ে পা সিধে হয়ে বল বরাবর এগিয়ে যায়। পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করা, ভিতর দিক বা শুধু পিঠ দিয়ে কিক্ করার মতো একই প্রয়োজনে কাজে লাগে। বল যখন খেলোয়াড়ের দিকে অথবা তার কিক্ করবার পায়ের ধার দিয়ে গাড়িয়ে আসে তখন বিশেষ করে এই কিক্ করা সহজ।



চিত্র ৭ ॥ পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করা।

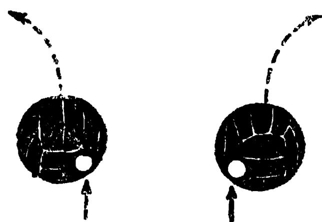
অন্যান্য কিক্। উপরে বলা ডিরেক্ট্ বা সিধে কিক্গুলি ছাড়াও আবো অনেক রকমের সিধে কিক্ আছে; যেমন পায়ের গোড়ালি দিয়ে কিক্ করা। এই কিকেও দাঁড়ানো পা-খানি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরকার মতো গতিতে বলের গায়ে ফিরে এসে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে। কাছাকাছি বল পাস্ করবার সময়ে প্রধানত এভাবে কিক্ করা হয়।

হাঁটু বা পায়ের তলা ইত্যাদির সাহায্যেও কিক্ করা হয়। কিন্তু এভাবে কিক্ করা হয় নেহাতই কালেভদ্রে, তাই এখানে আর তার বিবরণ দেওয়ার দরকার নেই।

"স্লাইস্‌ড" কিক্ (ট্যারচা কিক্)

পরোক্ষ বা ট্যারচা ("স্লাইস্‌ড") কিক্ সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আমরা কেবল ডিরেক্‌ট্ বা সোজাসোজি কিকের সঙ্গে তার তফাতটা দেখাব।

বল শূন্যে তোলা ও ডানদিকে বাঁকিয়ে ফেরাতে হলে খেলোয়াড়ের বাঁ দিক থেকে বল মারতে হবে। তেমনি বাঁ দিকে বাঁকিয়ে ফেরাতে গেলে মারতে হবে ডান দিকে (চিত্র ৮)। বল যত বেশি ট্যারচা করে মারা হবে, ততো বেশি বাঁকবে। বিপক্ষের খেলোয়াড় মাঝ-পথে বল আটকাতে এলে তা থেকে বাঁচাবার জন্য এ ধরনের কিক্ কাজে লাগে। কখনো কখনো বল পাস্ করা, কর্নার কিক্ ও ফ্রি কিক্ করার জন্যও এ কিক্ কাজে আসে।



চিত্র ৮ ॥ "ট্যারচা" কিকে বলের গতির নিশানা।

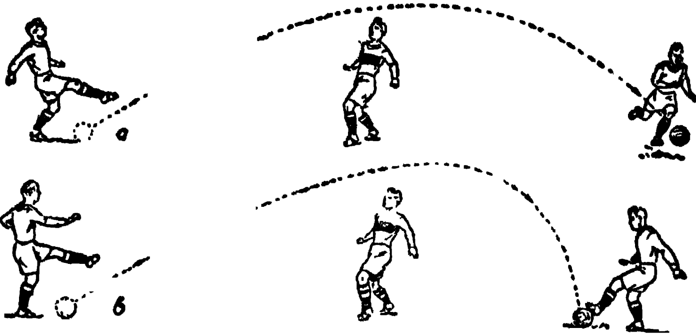
বলের নিচের দিকে তির্যক্‌ভাবে মেরে ট্যারচা কিক্ করা হয়। এতে বল পিছন দিকে উল্টে ঘুরে তার গতির শেষ সীমা অবধি উঠে গিয়ে সিধেসিধিভাবে মাটিতে এসে পড়বে। এ ধরনের কিক্ সাধারণত পায়ের পাতার পিঠ (ইন্‌স্টেপ) দিয়ে করা হয়। এতে পা বলের নিচে গিয়ে স্পর্শ করে ও সোজাসুজি কিক্ থেকে একটু বেশি সময় পর্যন্ত পায়ে লেগে থাকে।

এই কিকে পাশের দিকে বলের বক্রগতি ৯নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

"ট্যারচা" কিক্, বল পাস্ করা, কর্নার কিক্ করা, ফ্রি কিক্ করা, বিপক্ষ খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়ে বল টপকে দেওয়া ও বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি মারা ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা চলতে পারে।

দাঁড়িয়ে থেকে বা ছুটন্ত অবস্থায় স্থির বলে সোজা কিক্ বা বক্রগতির কিক্ করা চলতে পারে। ছুটন্ত অবস্থায় বলের গতি বাড়িয়ে দেবার জন্য কিক্ করতে হলে ছোট ছোট ধাপ ফেলে বলের কাছে এসে মারা চাই ও

দাঁড়ানো পা-খানি বলের খুব কাছাকাছি আছে কিনা সে-বিষয়ে খেলোয়াড়ের নিশ্চিত থাকা চাই। খুব বেশি লম্বা দৌড় দেওয়া বা অযথা ঘোরাঘুরি



চিত্র ৯ ॥ কিকের বিভিন্ন ধরন : (ক) সিধে বা ডিরেক্ট কিক্ (খ) ট্যারচা বা 'স্লাইসড্' কিক্।

লাফালাফি ইত্যাদি করা উচিত নয়। খেলোয়াড়-বিশেষে কিছু তারতম্য হলেও মোটামুটি পাঁচ-ছয় পা দৌড়ানোই সব থেকে ভালো।

স্থির বলকে দাঁড়িয়ে বা ছুটন্ত অবস্থায় কিক্ করা ছাড়াও খেলোয়াড় গড়ানো বল, মাটি ছেড়ে ওঠা বল, বা এক দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে অপরদিকে চলে যাওয়া বলকে দাঁড়িয়ে, ছুটে, বা লাফিয়ে, সিধে এবং বক্রগতিতে কিক্ করতে পারেন। এসমস্ত কিকের দাঁড়ানো পা খানি এমনভাবে রাখা উচিত যাতে কিক্ করবার পা-খানি সহজেই ঘোরাফেরা করতে পারে।



চিত্র ১০ ॥ মাথা টপকানো কিক্।

যখন খেলোয়াড়ের সামনে, পেছনে বা পাশে গড়াতে গড়াতে বল আসে তখন তার গতি কি রকম তা বিবেচনা করা দরকার ও দাঁড়ানো পা-খানি এমন অবস্থায় রাখা দরকার যাতে কিক্ করবার পা-খানি সময়মতো সহজেই উঠিয়ে তাক করে নিয়ে মারতে পারা যায়।

খেলোয়াড়ের পেছন দিক দিয়ে বল গড়িয়ে এলে ছোট করে ধাক্কা দেওয়া হয়, কারণ এ অবস্থায় পা-কে খুব বেশি টেনে নিয়ে বল মারা কঠিন।

মাটি ছেড়ে ওঠা বা শূন্যের বল মারতে গেলে শরীরের ভারসাম্য রাখবার জন্য দাঁড়ানো পা-খানি শক্ত করে গেড়ে রাখা উচিত ও কিক্ করবার পা-খানির উরু-সন্ধি যাতে সহজেই ঘুরতে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। খেলোয়াড়ের মাথার উপর ও তার দেহের আধাআধি উঁচুতে বল থাকলে খেলোয়াড় কিক্ করবার পা-খানি তুলে বলের দিক থেকে এমনভাবে হেলে থাকবেন যাতে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় থাকা যায় (চিত্র ১০)। মাথার উপর বা তারও উঁচুতে বল কিক্ করতে গেলে খেলোয়াড় পড়ে যেতে পারেন। সাধারণত ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়রা গোলের দিকে পেছন ফিরে ঘা-খেয়ে-ফিরে-আসা বা উঁচু-দিয়ে আসা বলে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু থেকে এমনি ধরনের মাথা টপকানো কিক্ করে থাকেন। পেছন থেকে বিপক্ষের দু-জন ফরোয়ার্ড বল কাড়াকাড়ি করতে এলে অনেক সময় ব্যাকের খেলোয়াড়কে নিজেদের গোলের দিকে মুখ করে নিরুপায় হয়ে মাথার উপর দিয়ে এই ধরনের কিক্ করতে হয়।

কাছাকাছি পাস করা বা পাঁচ থেকে দশ গজ দূরে পর্যন্ত বল মারবার সময়ে এমনি মাথার উপর থেকে কিক্ করা ভালো। এরকম কিক্ করতে গেলে দাঁড়ানো পা-খানি শক্ত করে মাটিতে গেড়ে রাখতে হয় ও মারবার পা-খানি প্রধানত উরু-সন্ধি থেকেই চালিত হয়। বল বরাবর যতো বেশি পা সামনে ছুঁড়ে দেওয়া যাবে মাথার ওপর দিয়ে বলও ততোখানি নিচু হয়ে ছুটবে।

নিচু দিয়ে 'মাথা টপকানো' কিক্-করার আরও উপায় হল খেলোয়াড়ের শরীরটা পেছনদিকে নিচু করে বাঁকিয়ে নেওয়া। উঁচু থেকে কোনো বলে কিক্ করতে গেলে খেলোয়াড়কে লাফিয়ে উঠে চিত হয়ে পড়তে পড়তেই শূন্যে কিক্ করতে হয়।

বল উঁচু দিয়ে আসার সময়ে কখনো কখনো লাফিয়ে উঠে কিক্ করতে হয়। এই ধরনের কিকের একটিকে বলে "সিজরস্" (কাঁচি) কিক্। এতে খেলোয়াড় শূন্য থেকে বল কিক্ করবার পর কিকের পা-খানি টেনে নামিয়ে আনেন ও অপর পা-খানি সামনে ছুঁড়ে দেন।

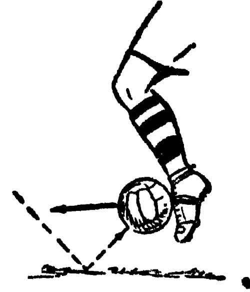
গড়ানো বল বা মাটি ছেড়ে ওঠা বলে নানা ভাবে কিক্ করা যায়। এখানে শুধু সব থেকে সাধারণ কিক্‌গুলোর বর্ণনা দেওয়া গেল।

বলকে উলটো ঘা মেরে ফেরানোর জন্য কিক্ করা হয় এ কিকের একটা

নাম "হাফ-ভলি" কিক্ (চিত্র ১১)। খেলোয়াড়কে খুব সতর্কতার সঙ্গে ঘা মারার সঠিক সময়টি নির্ধারণ করতে হয়।

এ ধরনের কিক্ পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে করতে হয়, কিকের সময়ে পায়ের ডগা শক্ত টান-টান থাকে ও হাঁটু থাকে বলের উপর ঝুঁকে।

এখানে গোলে বল মারবার কয়েকটি কৌশলের সংকেত দেওয়া হল।



চিত্র ১১ ॥ হাফ-ভলি। —কিকের গতিপথ, ···বলের গতিপথ।

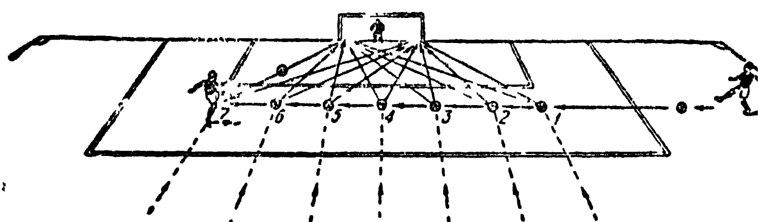
গোলের কাছ থেকে মাটির উপর গড়িয়ে-আসা বলে কিক্ করবার সময়ে খেলোয়াড় গোলের দূরত্ব, গোলের কাছে কোন্ জায়গাটিতে তিনি বল পেয়েছেন, কোন্ দিকে দৌড়োতে হবে, এসব বিচার করবেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বল মারবার কথা আমরা এখানে বলব, বিশেষ করে গোলের ছয় থেকে নয় গজ পর্যন্ত দূর থেকে যে বল মারা হয় তার কথা। ডান দিক থেকে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসা কোনো বলের দিকে যদি কোনো খেলোয়াড় সমকোণ করে ছুটে আসেন ও (চিত্র ১২) ১নং বিন্দুতে এসে বলটিকে ধরেন তা হলে তাঁর ডান পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিয়ে কিক্ করা উচিত। এখান থেকে ওই পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করা কঠিন।

খেলোয়াড় যদি কোনো বল ২নং বিন্দু, অর্থাৎ সবচেয়ে নিকটবর্তী গোল পোস্টের ডান দিকে কোথাও এসে পান, তাহলে ১নং বিন্দুর মতো একই রকম কিক্ তিনি করতে পারেন, তবে সে কিক্ করতে হবে পায়ের পাতার পিঠের বাইরের পাশ দিয়ে।

যদি কোনো বল ৩নং বিন্দুতে এসে পাওয়া যায় অর্থাৎ ডান দিকের গোলপোস্টের সামনে তাহলে সবচেয়ে ভালো মারা যাবে ডান পায়ের পাতার পিঠের বাইরের পাশ দিয়ে ও ভেতর দিক দিয়ে। কারণ পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে বা উপর দিয়ে মারলে সাধারণত সঠিক নিশানায় পৌঁছায় না।

এই ক্ষেত্রে খেলোয়াড় বাঁ পায়ের ভিতর দিক দিয়েও মারতে পারেন, আবার বাঁ পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়েও মারতে পারেন।

যদি বল ৪নং বিন্দুতে অর্থাৎ গোলের মধ্যভাগের ঠিক বিপরীত দিকে এসে পাওয়া যায় তাহলে পায়ের পাতার ভিতর পাশ দিয়ে মারা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক অথবা পায়ের পাতার পিঠের মাঝখানটা দিয়ে ও পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে বল মারলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কিছু কম। খেলোয়াড় যে-কোনো পা দিয়ে বল মারতে পারেন।



চিত্র ১২ ॥ খেলোয়াড়ের গতিপথ ;——বলের গতিপথ।

৫ নং বিন্দু থেকে ডানপায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক, বাঁ পায়ের পিঠের ভিতর দিক অথবা বাঁ পায়ের পাতার ভিতরের পাশ দিয়ে খেলোয়াড়কে কিক্ করা উচিত।

৬ নং বিন্দুতে বাঁ পায়ের পাতার পিঠের ভিতরদিক দিয়ে কিক্ করাই বেশি কাজের হবে।

৭ নং বিন্দুতেও পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে কিক্ করা উচিত।

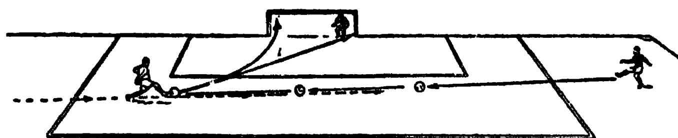
বল যদি বাঁ দিক দিয়ে আসে তবে উপরের সবগুলি কিক্ই অন্য পা দিয়ে (অর্থাৎ ডানের স্থলে বাঁ এবং বাঁয়ের স্থলে ডান) করা চলে।

গোলের তেরো থেকে ষোলো গজ দূর দিয়ে যখন বল যায় তখন এসব কিকের কিছু রদবদল হয়।

সে ক্ষেত্রে ছ-সাত গজ দূর থেকে খেলোয়াড যত জোরে কিক্ করতেন তার চেয়ে বেশি জোরে কিক্ করা উচিত ও পায়ের পাতার ভিতরদিক দিয়ে কিক্ না করাই সঙ্গত। ছ সাত গজ দূর থেকে কিক্ করার যে নিয়ম, অন্যান্য কিকের বেলায়ও তেমনই করতে হবে।

ফরোয়ার্ডেব খেলোয়াড়রা যেমনভাবে বল ধরেন ও বল পাঠান, ব্যাক ও হাফব্যাকের খেলোয়াড়দেরও তেমনিভাবে বল ধরতে ও কিক্ করতে হবে।

কাছাকাছি বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় না থাকলে খেলোয়াড় যে-কোনো পা দিয়ে কিক্‌ করতে পারেন। তা না হলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নেবার জন্য যে পা-টা বলের খুব কাছে তা দিয়েই কিক্‌ করবেন।



চিত্র ১৩ ॥ ······বল ধরবার জন্য খেলোয়াড়ের গতিপথ
——বলের গতিপথ।

পাঁচফুটের বেশি উঁচুতে যাতে বল না ওঠে সব খেলোয়াড়কেই তেমনি ভাবে কিক্‌ করতে হবে।

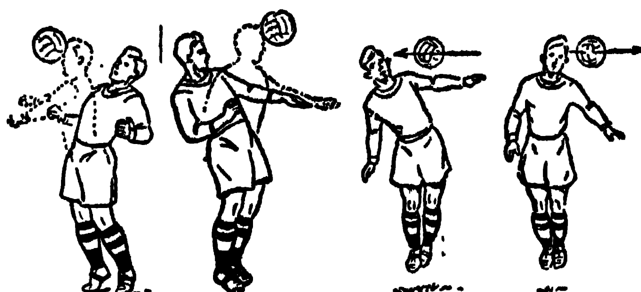
এমন অবস্থা আসতে পারে যখন কোনো খেলোয়াড় বিপক্ষের গোলের কাছে নিচু করে পাস্‌ করে দেওয়া কোনো বল ধরবার জন্য ছুটে গেছেন, এ অবস্থায় বল যদি ডান প্রান্ত থেকে আসে এবং খেলোয়াড় আসেন বাঁ দিক থেকে তাহলে কিভাবে কিক্‌ করতে হবে নিচে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

ছবিতে চিহ্নিত ১ নম্বর স্থান থেকে মারতে গেলে ডান পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে কিক্‌ করা উচিত। বলকে বাঁকিয়ে গোলের দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বাঁ পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে চেপে নিচু দিকে কিক্‌ করলেও একই ফল পাওয়া যাবে (চিত্র ১৩)। পায়ের পাতার পিঠের মাঝখান থেকেও কিক্‌ করা চলতে পারে। ছবিতে চিহ্নিত ২ নম্বর স্থান থেকে কিক্‌ করতে গেলে ডান পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে কিক্‌ করাই সব থেকে ভালো। ৩ নম্বর স্থান থেকে কিক্‌ করতে হলে ডান পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক দিয়ে চেপে মারা ভালো। যদি বল আসে বাঁ প্রান্ত থেকে ও খেলোয়াড় আসেন ডান দিক থেকে তাহলে সব সময়ে বিপরীতভাবে কিক্‌ করতে হবে।

কিক্‌ করার সফলতা নির্ভর করছে গোলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কতো দূরে কোন জায়গায় বল আছে তার ওপর।

বল হেড্ করা

খেলোয়াড় দাঁড়ানো অবস্থায় বা লাফিয়ে বল হেড্ করতে পারেন। বল সামনের দিকে হেড্ করে পাঠাতে হলে খেলোয়াড়কে প্রথমে পেছনের দিকে হেলে, তারপর শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে কপাল অথবা মাথার ডান কি বাঁ-পাশ দিয়ে বলে আঘাত করতে হবে। বলের সঙ্গে সংঘর্ষটা জোরালো করতে হলে মাথাটাকেও সামনে ঠেলে দিতে হবে (চিত্র ১৪)। ডান অথবা বাঁ দিকে বল পাঠাতে হলে শরীর পাশের দিকে কাত করে মাথার পাশ দিয়ে আঘাত করুন।



চিত্র ১৪ ॥ না লাফিয়ে হেড্ করা। চিত্র ১৫ ॥ লাফ দিয়ে হেড্ করা। চিত্র ১৬ ॥ পাশের দিকে হেড্ করা।

লাফিয়ে হেড্ করবার সময় খেলোয়াড় যখন লাফের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছেন তখন আঘাত করতে হবে। বলে আঘাত পড়া চাই খুব জোরে। খেলোয়াড়কে পেছন দিকে একটুখানি চিতিয়ে শরীরটাকে এমনভাবে টানটান করতে হবে যেন তিনি দাঁড়ানো অবস্থাতেই বলটাকে হেড্ করছেন। (চিত্র ১৫)। আঘাতের মুহূর্তটা পর্যন্ত চোখ রাখতে হবে বলের ওপর খেলোয়াড় যদি আগেই লাফিয়ে ওঠেন কিংবা দেরি করে ফেলেন তাহলে ঠিকমতো বলে আঘাত করতে পারবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় কপাল দিয়ে হেড্ করতে পারলে। পাশে কোনো নিজ দলের খেলোয়াড়কে হেড্ করে বল দিতে হলে মাথার এক পাশ দিয়ে আঘাত করতে হবে। এ অবস্থায় খেলোয়াড় পাশের দিকে কাত হয়েই চট্ করে আবার সোজা হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটাকে প্রবলভাবে পাশের দিকে ঠেলে দেবেন (চিত্র ১৬)।

হেড্ করে নিচু দিকে বল পাঠাতে হলে শরীর পেছন দিকে চিতিয়ে তারপরেই আবার সিধে টানটান করুন আর সেই সঙ্গে কপাল বা মাথার পাশ দিয়ে বলে আঘাত করুন।

বল থামানো ও বল পাকড়ানো

মাটির ওপরেই অথবা মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠার সময় বলকে পা, মাথা কিংবা শরীর দিয়ে আটকানো যায়। একাজ করার নানা রকম কায়দা আছে।

বল পাকড়ানো। বল আটকাতে হলে খেলোয়াড়কে বলের ওপর পা রেখে মাটিতে চেপে ধরতে হয় (চিত্র ১৭)। খেলোয়াড় এমনভাবে বলের দিকে ছুটে আসবেন যাতে বলাটা ঠিক তার পায়ের ভেতরের দিকে ঘেঁষে পড়ে। যে পায়ে বল আটকাবেন সে পা শিথিলভাবে রাখা চাই, আর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে দাঁড়ানো পায়ের ওপর।



চিত্র ১৭ ॥ বলের ওপর পা রেখে বল পাকড়ানো।



চিত্র ১৮ ॥ পায়েব পাতার ভেতর দিক দিয়ে বল আটকানো।

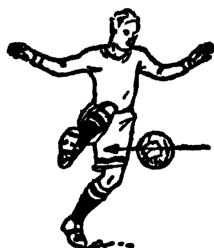
এই পদ্ধতিতে বল পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া চলে। বিপক্ষের একেবারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এভাবেই বল থামাতে হয়।

বল থামাতে থামাতেই বল-আটকানো পা-খানির ডগা সামান্য তুলে খেলোয়াড় সেটাকে ফের সামনে এগিয়ে দিয়ে খেলা চালু রাখতে পারেন। খেলাতে যখন দ্রুততার প্রয়োজন তখন এ পদ্ধতি ফলপ্রদ।

পায়ের পাতার ভেতরের দিক দিয়ে বল থামানো—এটা করা সম্ভব নিম্নোক্ত উপায়ে: খেলোয়াড় প্রথমে বলের গতি ঠাহর করে নেন।

তারপর দাঁড়ানো পায়ের অবস্থান ঠিক করে নিয়ে আলগা পা-খানি শূন্যে তোলেন—এ অবস্থায় আলগা পায়ের ভেতরের দিকটা গড়িয়ে-আসা বলের দিকে ফেরানো থাকে। পায়ের সঙ্গে লাগার পর বল হয় থেমে যায়, নয়তো ঘা খেয়ে ফিরে যায়—সেটা নির্ভর করে আলগা পা-খানি কতোটা শিথিল ছিল তার ওপর (চিত্র ১৮)। মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠা বলও ঠিক এমনি-ভাবেই থামানো চলে (চিত্র ১৯)।

ওপর থেকে ড্রপ্ খেয়ে পড়া বল একটু অন্যভাবে থামাতে হয়। পা-টিকে তখন জমির সঙ্গে একটা বিশেষ কোণে (অ্যাঙ্গেল) রাখতে হয় (চিত্র ২০)। এ ধরনের বল আটকাতে হলে খেলোয়াড় প্রথমে বলটিকে জমি স্পর্শ করতে দেবেন। পর মুহূর্তেই পায়ের পাতার ভেতরের দিক দিয়ে



চিত্র ১৯ ॥ পা তুলে বল আটকানো



চিত্র ২০ ॥ মাটিতে ড্রপ্ খাওয়া বল পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে আটকানো।

মাটির ওপর আস্তে করে বলটাকে চেপে ধরবেন। দরকার মতো বলটিকে মাটির ওপর ‘লাফ খাওয়াতে’ হলে পা আলগা করে ধরে রাখতে হবে।

পায়ের পাতার বাইরের দিক দিয়ে বল থামানো। পায়ের পাতার ভেতরের দিক দিয়ে বল আটকানোর যে পদ্ধতি এক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।

মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠা বল আটকাতে হলে শিথিল পা-খানির বাইরের দিক দিয়ে বল ধরতে হবে। ড্রপ্ খাওয়া বল থামাতে হয় অন্য কায়দায়: বল যে জায়গাটিতে এসে পড়ছে তারই সামান্য পেছনে রাখতে হয় দাঁড়ানো পা-খানি। দাঁড়ানো পায়ের ডগার খুব কাছেই বল ড্রপ্ পড়া চাই।

বলটিকে আটকাবার সময় খেলোয়াড়ের উচিত সেটিকে পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া, কিংবা আয়ত্তের মধ্যে রাখবার জন্য বলকে 'লাফ খাওয়ানো'।

মাথা দিয়ে বল ঠেকানো। এটা করতে হলে খেলোয়াড়কে দেহ ও পায়ের সাহায্য নিতে হবে। বল যতো কাছে আসতে থাকবে, পা দুটোকেও সঙ্গে সঙ্গে বাঁকাতে হবে। মাথা যখন বলে লাগবে, পা দুটোও চট্‌ করে বেঁকে যাবে। আর ঠিক এই মুহূর্তটিতে খেলোয়াড় দেহটাকে আলগা করে মাথা গুঁজে নেবেন ঘাড়ের মধ্যে।







চিত্র ২১॥ বুক দিয়ে বল ঠেকানো। চিত্র ২২॥ পেট দিয়ে বল ঠেকানো। চিত্র ২৩॥ উরু দিয়ে বল ঠেকানো।

বুক দিয়ে বল ঠেকানো। এটা করতে হলে খেলোয়াড় সামনে অথবা নিচের দিকে বাহু দুটো একটু ছড়িয়ে নেবেন, আর বুক দিয়ে আটকাবেন বলকে। বুক যেন ভেতরের দিকে টেনে নেওয়া না হয়—অনেকে যেমনটি করে থাকেন। কারণ এতে বল গড়িয়ে নেমে যাবার ভয়, পায়ের ডগা থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়ে বলটা আছাড় খেতে পারে। পক্ষান্তরে বুক চিতিয়ে রাখলে বলটা বেশি দূরে গিয়ে আছাড় খাবে না কিংবা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে না (চিত্র ২১)।

পেট দিয়ে বল ঠেকানো। বল যখন মাটিতে ধাক্কা খেয়ে উঠছে তখন অনেক সময় ওপর-পেট দিয়ে ঠেকানো হয়ে থাকে। বল ঠেকাবার সময় ওপর-পেটের মাংসপেশী যেন শক্ত থাকে (চিত্র ২২)। বল যখন শূন্য দিয়ে আসছে সে সময় পেট দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করাই ভালো।

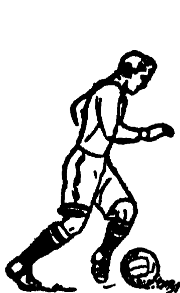
উরু দিয়ে বল থামানো। উঁচু থেকে বল ড্রপ্‌ পড়ার সময় এ পদ্ধতিটা কাজে লাগে। শিথিল পা-খানি দিয়ে বল ঠেকাতে হয়।

উরুতে লাগবার পর বলটা আস্তে করে মাটিতে নামে (চিত্র ২৩)। বল যখন খেলোয়াড়ের দিকে ছুটে আসছে, তখন তিনি উরু ব্যবহার করতে পারেন।

পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে বল থামানো। যে বল ড্রপ্ খাচ্ছে এমন বলকেই সাধারণত পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে থামানো হয়ে থাকে। এটার পদ্ধতি হল: বল আটকাবার জন্য খেলোয়াড় পা উঁচুতে তুলবেন, তারপর পায়ের পাতার গাঁট (অ্যাংকল্-জয়েণ্ট) শিথিল করে, বল যখন প্রায় পায়ের সংস্পর্শে এসে পড়ছে তখন সাবধানে পা ঠেকিয়ে বলটাকে মাটিতে ড্রপ্ দেবেন।

বল আয়ত্তে রাখা (বল-কণ্ট্রোল)

তাড়াতাড়ি বলকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য খেলোয়াড বলের দু'পাশ থেকে ক্রমাগত ছোট ছোট লাথি মেরে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যান (একে 'ড্রিব্লিং' বলে) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পায়ের



ক



খ

চিত্র ২৪ ॥ ড্রিব্লিং : (ক) পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে। (খ) পায়ের পাতার পিঠের ভেতরের দিক দিয়ে।

পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে বলকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, পায়ের পাতার পিঠের ভেতর দিক দিয়ে এ কাজ কমই করা হয়ে থাকে।

বলকে যদি সোজা একটা সরল রেখা ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার সবচেয়ে ভালো উপায় হল পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিকটাকে ব্যবহার করা। বলকে বাঁকা পথে পরিচালনা করতে হলে পায়ের পাতার পিঠের ভেতর দিকটাকে ব্যবহার করতে হবে (চিত্র ২৪)। বল আয়ত্তে রাখার জন্য খেলোয়াড় দুটো পা-ই ক্রমাগত ব্যবহার

করতে পারেন—একবার এ পা, একবার ও পা, এই হিসেবে। কিন্তু কোনোক্রমেই যেন কিক্ করে বলটাকে বেশি সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া না হয়। খেলোয়াড়ের দৌড়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে কিকের জোর এবং কতোখানি ঘন-ঘন আঘাত দিতে হবে, তা নির্ণয় করা চাই। যখন কাছে-পিঠে বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় নেই তখন সবচেয়ে ভালো হবে প্রায় ১২ গজ দূর অবধি বলটা কিক্ করে ঠেলে দেওয়া এবং এইভাবে বলের পেছু-পেছু ধাওয়া করা।

বল যখন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন খেলোয়াড় স্বভাবতই চাইবেন যাতে বিপক্ষের লোকেরা এসে বল কাড়াকাড়ি (ট্যাক্‌ল্) করে। যদি খেলোয়াড়ের ডানদিক থেকে কেউ বল কাড়তে আসে তাহলে তিনি বাঁ পা দিয়ে বল ঠেকাবেন এবং নিজের দেহ দিয়ে বলকে আড়াল করবেন। বলের তলার দিকে কিক্ করা চাই।

বিপক্ষের সঙ্গে চাতুরী

বিপক্ষের পাশ কাটিয়ে বল নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়কে ছল-কৌশল করে পা, শরীর বা মাথার ভঙ্গি করতে হতে পারে।

এসব চাতুরীপূর্ণ দেহভঙ্গির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বিপক্ষকে ঠকাবার জন্য আকস্মিক কৌশল প্রয়োগ করা, নিজের আসল মতলব সম্পর্কে তাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেওয়া, এবং এইভাবে বাধামুক্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ভঙ্গিটি যতো আচম্‌কা ও চট্ করে বুদ্ধি খেলিয়ে করা যাবে ততোই ভালো। ফুটবলের চাতুরীপূর্ণ ভঙ্গি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে বল সামনে এগিয়ে নেবার জন্য অথবা বিপক্ষের রক্ষণভাগের পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য।

চাতুরীগুলো এত অসংখ্য ও ব্যক্তিবিশেষে এত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। লেখকরা তাই মাত্র কয়েকটির কথাই উল্লেখ করছেন।

পায়ের কাজ। বিপক্ষের কেউ বল কেড়ে নিতে এসেছে। কাড়াকাড়ি এড়াবার জন্য খেলোয়াড় এমনভাবে পা তোলেন যেন এখুনি কিক্ করবেন। বলটাকে মাঝপথে ধরবার আশায় বিপক্ষ সরে যান কিন্তু খেলোয়াড় তখন কিক্ করবার বদলে হঠাৎ আগের মতোই বল নিয়ে

ছুটতে আরম্ভ করে দেন। অনেক সময় খেলোয়াড় এমনভাবে পা তোলেন যেন এইমাত্র ডান কি বাঁ দিকে বল কিক্ করবেন, কিন্তু একেবারে চরম মুহূর্তে বলের ওপর পা এনে সেটাকে অন্য আরেক দিকে ঠেলে দেন। বিপক্ষের লোক বোকা বনে যায়। রাস্তাও তখন পরিষ্কার (চিত্র ২৫)।

শরীর ঝোঁকানো। বল নিয়ে খেলোয়াড় ছুটছেন এমন সময় তার দিকে এগিয়ে এল বিপক্ষের লোক। দুজনের মধ্যে যখন দু'তিন গজের



চিত্র ২৫॥ চাতুরীপূর্ণ পায়ের ভঙ্গি।

তফাত তখন খেলোয়াড় বাঁ দিকে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে দিলেন, এবং একই সঙ্গে বাঁ পাটাও পাশের দিকে ফেলে সেদিকেই এমনভাবে তাকালেন যেন তাঁর ইচ্ছাটা ওদিকে সরে যাওয়া। বল আটকাবার জন্য বিপক্ষও পাশের দিকে পা ফেলে সরে এলেন। খেলোয়াড় তখন হঠাৎ বাঁ পাটা চট্ করে তুলে নিয়েই যেদিকে ছুটছিলেন সেদিকে ফের ছুটে চললেন। গোড়াতে বল যেমন গড়িয়ে যাচ্ছিল সেইদিকেই যেতে থাকবে, অথচ এর মধ্যে দ্রুতবেগে সমস্ত ভঙ্গিগুলো সেরে ফেলতে হবে।

কোনো কোনো খেলোয়াড় আবার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যাবার কৌশল নিয়ে থাকেন। ফরোয়ার্ড বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন, পাশাপাশি বিপক্ষের খেলোয়াড়রাও দৌড়োচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে খেলোয়াড়কে ধরে ফেলে তাঁর বল আটকাবার। হঠাৎ তিনি থেমে পড়ে বলটাকে পায়ের নিচে চেপে ধরলেন। বিপক্ষের লোকরাও দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তারা থামবার সঙ্গে সঙ্গে ফরোয়ার্ড হঠাৎ আবার যেন দৌড়োচ্ছিলেন তেমনি দৌড়োতে শুরু করলেন। এইভাবে থামার ফলে তিনি প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে আগে চলে যেতে পারেন, রক্ষণভাগকে বিপর্যস্ত করতে পারেন।

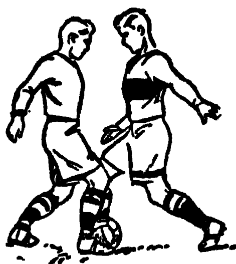
'পেছন-গোড়ালির' কৌশল। খেলোয়াড় বল নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এমন ভাব করেন যেন এখনই গোড়ালি দিয়ে বলটাকে কিক্ করে পেছন দিকে পাঠাবেন। বিপক্ষও স্বভাবতই একটু ঝিমিয়ে পড়ে। খেলোয়াড় সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ছুটে যেতে থাকেন।

কৌশলটা এই রকম হওয়া উচিত: বল নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে খেলোয়াড় চট্ করে পা-টা বলের উপর বাড়িয়ে ধরলেন, পরক্ষণে ঠিক সেই রকম তাড়াতাড়ি ফের পা সরিয়ে নেবেন। যে পা-খানি বিপক্ষের কাছ থেকে দূরে থাকবে সেই পা দিয়ে এ-কাজ করতে হবে।

বল-কাড়াকাড়ি বা ট্যাক্লিং

বল কাড়াকাড়ি করার আগে খেলোয়াড়কে বুঝে নিতে হবে ঠিক কোন্ দিক থেকে বল আসছে এবং ঠিক সময় মতো তিনি বলটাকে মাঝ-পথে আটকাতে পারবেন কিনা।

বল কাড়াকাড়ি (ট্যাক্ল্) করার সময় চোখ রাখতে হবে বলের ওপর। যদি মাঠের মাঝখানে অথবা পাশের দিকে যেখান থেকে গোল হবার আশু সম্ভাবনা কম—এরকম জায়গায় ট্যাক্ল্ করতে হয়, তা হলে খেলোয়াড় পা



চিত্র ২৬॥ (বল কাড়াকাড়ি) ট্যাক্ল্ করা।



চিত্র ২৭॥ ট্যাক্ল্ করা। পায়ের অবস্থান।

বাড়িয়ে দিয়ে বলের রাস্তায় পা বসাবেন, আর শরীরের ভারসাম্যের দিকে খেয়াল রাখবেন। এটা করতে হলে পায়ের পাতার ভেতরের দিকটা সজোরে বলের ওপর চেপে ধরতে হবে, দেহের ভার ছেড়ে দিতে হবে ওই পা-খানির ওপর, আর ওপর থেকে বলটাকে এমনভাবে পা দিয়ে আড়াল করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষের পায়ের ওপর বলটা ধাক্কা না খায় (চিত্র ২৬ ও ২৭)। এতে

খেলোয়াড় যদি বিফলও হন, তবু তার পক্ষে ফের ট্যাক্‌ল্‌ করার সুযোগ থাকবে।

গোল লক্ষ্য করে বল মারছে এমন কোনো খেলোয়াড়কে ট্যাক্‌ল্‌ করতে গেলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের উচিত হবে দু'এক পা এগিয়ে এসে লম্বা গোঁত্তা দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে বলটাকে ঠেকানো, যাতে সেটা গোলে ঢুকতে না পায়।

যিনি ট্যাক্‌ল্‌ করবেন তাঁকে চট্‌ করে আগেই ঠিক করে ফেলতে হবে কোন্‌ অবস্থানে এবং কোন্‌ পা দিয়ে তিনি বল আটকাবেন। বল কাড়বার



চিত্র ২৮ ॥ স্লাইডিং ট্যাক্‌ল্‌

সময় তাঁকে হয়তো প্রতিপক্ষকে 'চার্জ' করতে হতে পারে, কিন্তু সেটা হওয়া চাই খেলার নিয়ম-কানুন অনুযায়ী।

প্রতিপক্ষকে চার্জ করবার সময় খেলোয়াড় তাঁর বাহু দুটোকে শরীরের সঙ্গে সজোরে সেঁটে রাখবেন। প্রতিপক্ষের পাশাপাশি দৌড়োবার সময় সে যখন ভারসাম্য বা ব্যালান্স বজায় রাখতে পারছে না ঠিক এমনি মুহূর্তে তাকে চার্জ করা হয়তো সুবিধাজনক হতে পারে। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নেবার আরেকটা পদ্ধতি হল হেলে পড়ে বা কাত হয়ে (স্লাইডিং) ট্যাক্‌ল্‌ করা (চিত্র ২৮)।

বল 'থ্রো' করা

লাইনে দাঁড়িয়ে নানারকম উপায়ে বল ছোঁড়া যেতে পারে। সবই নির্ভর করবে বলকে আঁকড়াবার কায়দা ও পায়ের অবস্থানের ওপর।

ধরার কায়দা। প্রথম উপায়—বলটাকে একটু পেছনের দিকে দু' হাতের আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে, বুড়ো আঙুল দুটো ২-১ ইঞ্চি ফাঁক

করে (চিত্র ২৯)। এতে চট্ করে কব্জি দুটো বাঁকিয়ে বলের গতি বাড়িয়ে দেওয়া চলে।

ধরার কায়দা। দ্বিতীয় উপায়—বলের পেছনে কব্জিদুটো খুব কাছাকাছি থাকবে, বুড়ো আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবে, আঙুল ছড়ানো থাকবে বটে তবে খুব বেশি নয় (চিত্র ৩০)।

কব্জি চট্ করে বাঁকিয়ে এক্ষেত্রে বলের গতি বাড়িয়ে দেওয়া চলে।

প্রথম পদ্ধতিটাই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এতে ফলও পাওয়া যায় ভালো।



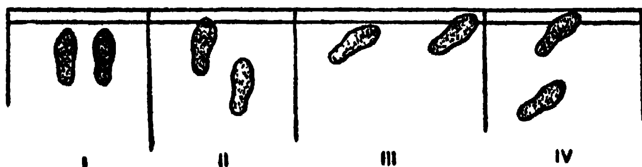
চিত্র ২৯ ॥ থ্রো করা
(প্রথম পদ্ধতি)।



চিত্র ৩০ ॥ থ্রো করা
(দ্বিতীয় পদ্ধতি)।

পায়ের অবস্থান। প্রথম উপায়—পায়ের ডগা মাঠের দিকে রেখে সমান্তরালভাবে পায়ের পাতা দুটো বসানো হয়। চিত্র ৩১, ১নং অবস্থান)।

পায়ের অবস্থান। দ্বিতীয় উপায়—এক পা আরেক পা থেকে খানিকটা সামনে [সিধে দাঁড়ানো অবস্থায় 'থ্রো' করতে হবে] (চিত্র ৩১,

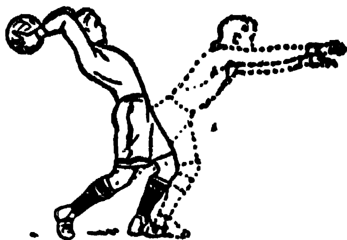


চিত্র ৩১ ॥ থ্রো করার সময় পায়ের পাতার অবস্থান।

২নং অবস্থান)। এ অবস্থানে বলের গতি বাড়িয়ে দেবার জন্য অনেক সময় কয়েক ধাপ ছুটে যেতে হয়।

পায়ের অবস্থান। তৃতীয় উপায়—পা দুটিকে পরস্পরের সমান্তরালে ও মাঠের দিকে পাশ করে রাখতে হবে। (চিত্র ৩১, ৩নং অবস্থান)।

পায়ের অবস্থান। চতুর্থ উপায়—এতে পায়ের পাতা দুটো সমান্তরালই থাকে, তবে বাড়ানো পায়ের বাইরের দিকটা মাঠের দিকে সামান্য ঘোরানো থাকে। (চিত্র ৩১, ৪নং অবস্থান)।



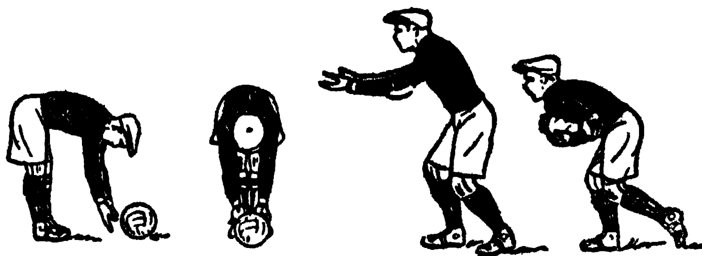
চিত্র ৩২ ॥ থ্রো করা।

নিম্নোক্ত কায়দায় 'থ্রো' করা হয়ে থাকে : উপরে বর্ণিত যে-কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বলটিকে হাতে রেখে খেলোয়াড় পেছন দিকে ঝুঁকে বলটা মাথার পেছনে তুলে ধরেন। তারপর চট্ করে সোজা হয়েই বলটাকে ছুঁড়ে দেন পেছনের পায়ের সাহায্যে ঠেলা দিলে বলের গতিও বেড়ে যায়। (চিত্র ৩২)।

গোল বাঁচাবার কায়দা

মাটিতে গড়িয়ে আসা বল নিম্নোক্ত উপায়ে গোলরক্ষক ধরতে পারেন :

ঝুঁকে পড়ে হাতের তালু সামনের দিকে ঘুরিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবেন বলের দিকে—আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে থাকবে, হাঁটুজোড়া টান-টান হয়ে এমনভাবে এঁটে থাকবে যাতে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে বল না বেরিয়ে যায়। (চিত্র ৩৩)।



চিত্র ৩৩ ॥ গড়িয়ে আসা বল আটকানো।

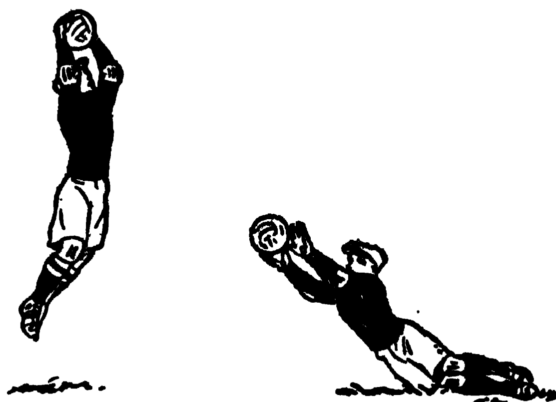
চিত্র ৩৪ ॥ পেটের সমান উঁচুতে বল আটকানো।

বলটা যে-মুহূর্তে তাঁর হাতের তালুতে এসে ঠেকবে সঙ্গে সঙ্গে গোলরক্ষক বলটাকে নিজের ওপর-পেটের দিকে টেনে নেবেন এবং খাড়া

হয়ে উঠবেন। বল যদি পাশের দিকে খানিকটা গড়িয়ে যায় তাহলে তিনিও পাশের দিকে গিয়ে সেটাকে ধরবেন।

যদি বলটা তাঁর পেটের সমান উঁচুতে ছুটে আসতে থাকে, তাহলে গোলরক্ষক হাতের তালুর মধ্যে বল ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবেন। বলের গতিবেগ নষ্ট করবার জন্য বলের ঝোঁকটা সামলে নিয়ে নিজের কোলের দিকে তাড়াতাড়ি টেনে নেবেন (চিত্র ৩৪)। বল এইভাবে তাঁর বুক আর কব্জির মাঝখানে চাপা পড়বে। যদি বলটা পাশের দিকে সামান্য গড়িয়ে যায় তাহলে গোলরক্ষক নিজেও একটু সরে গিয়ে ধরবেন।

মাথার ওপর দিয়ে বল এলে, গোলরক্ষক হাত উঁচুতে তুলে ধরবেন। হাতের তালু ওপরের দিকে ঘোরানো থাকবে আর আঙুলগুলো থাকবে ছড়ানো (চিত্র ৩৫)। বল চেপে ধরেই গোলরক্ষক বলটাকে চট্



চিত্র ৩৫ ॥ উঁচু দিয়ে বল ঠেকানো।

চিত্র ৩৬ ॥ বল হাতে নিয়ে পড়ে যাওয়া।

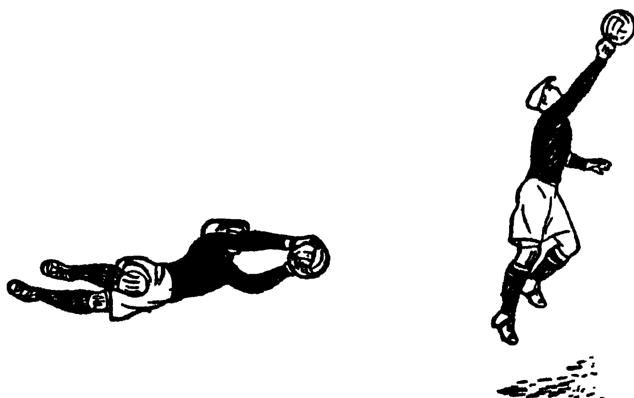
করে নিজের পেটের দিকে টেনে নেবেন। বল যদি দ্রুতবেগে আসে তাহলে তিনি প্রথমে হাত দিয়ে বলের ঝোঁকটা সামলে নেবেন, তারপর টেনে নেবেন পেটের দিকে।

বল যখন বেশ একটু দূরে, অর্থাৎ এত নিচুতে বা এত উঁচুতে যে দাঁড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না, তখনই শুধু লাফ দেওয়া বা 'ডাইভ' দেওয়ার প্রয়োজন হয়। দুপায়ের যে কোনো একটার ওপর জোর ঠেলা দিয়ে লাফ

মারতে হবে। ঠেলা দেবার আগে হয়তো পা দুটোকে আড়াআড়ি (ক্রস্-স্টেপ্) রাখতে হতে পারে; ডানদিকে লাফ দিতে হলে গোলরক্ষক তাঁর বাঁ-পাটাকে এগিয়ে দেবেন ডান দিকে (ডান পায়ের ওপর দিয়ে), তারপর ডান পা দিয়ে আরেকটা ধাপ এগিয়েই লাফ দেবেন।

'ডাইভ্' বা দেহনিক্ষেপ করার উপায় আছে দু'রকম। কোনো কোনো গোলরক্ষক ডাইভ্ দেন প্রথমে পা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে, তারপর দেহ এবং সবশেষে হাত ছুঁড়ে (চিত্র ৩৬)। অনেকে আবার গোড়াতেই হাত বাড়িয়ে ডাইভ্ দেন (চিত্র ৩৭)।

গোলরক্ষকের এক হাতে বলে ঘুষি মারতে পারা চাই। সাধারণত বল



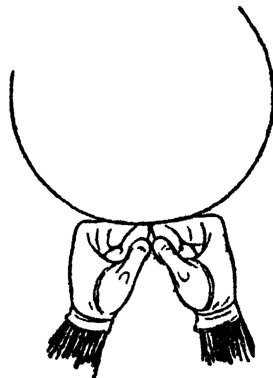
চিত্র ৩৭ ॥ বল সমেত ডাইভ্ দেওয়া। চিত্র ৩৮ ॥ বলে ঘুষি মারা।

যখন একটু উঁচু দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে অথবা গোলের এধার থেকে ওধার আড়াআড়ি ছুটে যাচ্ছে তখনই তিনি ঘুষি মারেন (চিত্র ৩৮)।

চার বা পাঁচ ফুট ওপর দিয়ে বল যখন তাঁর পাশের দিকে ছুটে আসছে তখনো তিনি বলটাকে ঘুষি মেরে সীমানা রেখার দিকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। বল যখন হাতে ধরার উপায় নেই তখনই শুধু গোলরক্ষক ঘুষি ব্যবহার করবেন।

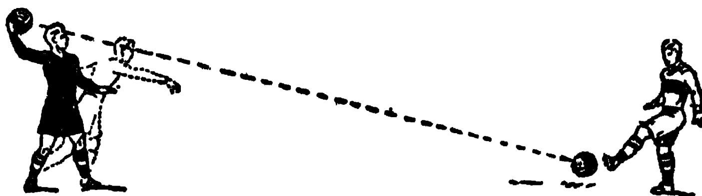
এক হাতে ঘুষি মারা দু'হাতে মারার চেয়ে সুবিধাজনক, কারণ এতে অনেক বেশি উঁচু বলেরও নাগাল পাওয়া সম্ভব।

যদিও দু'হাতে ঘুষি মারা (চিত্র ৩৯) অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য কারণ এতে নিশানা অনেক বেশি সঠিক হয়, তবু এতে সাবলীলভাবে নড়াচড়া করার অসুবিধা, শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে টান-টান করাও যায় না। বল যখন গোলের কাছাকাছি নেমে আসছে এবং বিপক্ষের আক্রমণকারীরা যখন গোল-রক্ষককে ছেঁকে ধরে তাকে বল পাকড়াতে দিচ্ছে না, তখনই সাধারণত বলে ঘুষি মারার প্রয়োজন হয়।


চিত্র ৩৯। দু'হাতে বলে ঘুষি মারা।

এক হাতে লম্বা 'থ্রো' করতে পারা চাই গোলরক্ষকের। ভালো 'থ্রো' করতে হলে খেলোয়াড কাঁধের পেছন দিকে (এক হাতে) বল টেনে নিয়ে কব্জি ভেঙেই বলটাকে ছুঁড়ে দেবেন। হাত থেকে বল বেডিয়ে যাবার সময় সেই হাতের উল্টো দিকের পা-টা যেন সামনে বাড়ানো থাকে। এভাবে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর পর্যন্ত সঠিক নিশানায় বল 'থ্রো' করা সম্ভব (চিত্র ৪০)।

বল নিয়ে এগিয়ে যাবার সময় গোলরক্ষক ইচ্ছা করলে হাত দিয়ে মাটিতে বলটিকে 'ড্রপ্' দিতে দিতেও নিয়ে যেতে পারেন। বল হাতে নিয়ে


চিত্র ৪০॥ টিম সহযোগীর পায়ে বল ছুঁড়ে দেওয়া (২০—৩০ গজ দূরত্বে)।

চার ধাপের বেশি না এগোলেও চলে। তখন এক হাত বা দু-হাতে বলটাকে মাটির ওপর ড্রপ্ খাওয়াতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন বলটা হাত-ছাড়া হয়ে না যায়।

মাঠের ওপর দিয়ে সোজাসুজি কিক্ করে বল পাঠানো গোলকীপারের একটি প্রধান কাজ। যদি কিক্ ভালো করতে না পারেন তাহলে গোল-রক্ষণে সঠিক দূরত্ব ও নিশানা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

গোলকীপার মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠা বল কিক্ করতে পারেন, আবার আস্তে করে ওপরে তুলে নিয়ে পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে সোজা সামনেও কিক্ করতে পারেন।

মাটিতে বসানো বা গড়ানো বল মারবার সময় গোলকীপার "বল কিক্ করার পদ্ধতি" অধ্যায়ে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেই কায়দা নিতে পারেন। দু'পায়ে কিক্ করা ও দু'হাতে 'থ্রো' করা—এ দুটোই গোল-রক্ষকের জানা থাকা চাই।

ফুটবলের কায়দা-কৌশল (ট্যাক্‌টিক্‌স্)

খেলা জেতার জন্য ব্যক্তিগত ও দলগত পরিকল্পনাই হল ফুটবল খেলার কায়দা-কৌশল। খেলার কায়দা-করণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দলগতভাবে সবাই মিলে ও ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন খেলোয়াড় সমাধান করেন।

ব্যক্তিগত কলাকৌশল

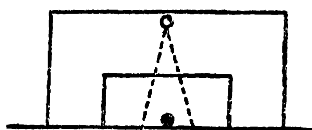
ব্যক্তিগত কলাকৌশল বলতে কি বোঝায়? দলের যে-কোনো নির্দিষ্ট জায়গার যে-কোনো খেলোয়াড় বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কোন্‌দিকে যেতে হবে না-হবে, কি কায়দা ব্যবহার করতে হবে, কখন আক্রমণ চালাতে হবে, কখন বা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে তা অতি দ্রুত বুঝে নিতে পারেন। এই প্রশ্নগুলির উপযুক্ত সমাধানের উপর নির্ভর করে খেলার ফলাফল। এমনিভাবে গোলরক্ষকের যদি বল আটকে দিতে দেরি হয় তবে বিপক্ষের খেলোয়াড় গোল দিয়ে ফেলতে পারেন।

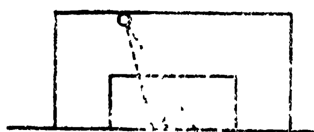
বিভিন্ন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত খেলাব কৌশলগুলি কি এবারে তা বুঝে নেওয়া যাক।

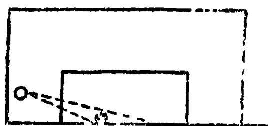
গোলরক্ষক

বল আসবার সময়ে গোলের মুখে জায়গা বেছে নেওয়া। কোনো বিশেষ খেলোয়াড় ঠিক কোন্ জায়গাটি লক্ষ্য করে বল মারছেন, বা কোন্ জায়গাটিতে তিনি সচরাচর বল মেরে থাকেন তা বুঝে নিয়ে তদনুযায়ী গোলরক্ষককে গোলে দাঁড়াবার নির্দিষ্ট স্থানটি বেছে নেওয়া চাই।

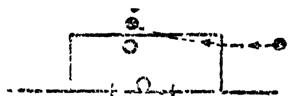
মাঝে মাঝে দর্শকেরা গোল লক্ষ্য করে মারা অধিকাংশ বলই গোলরক্ষক কি করে ধরে ফেলেন তা ভেবে অবাক্ হন। এর কারণ এই যে গোলরক্ষক কোন্ জায়গাটিতে বল আসছে তা বুঝে নিয়ে ঠিক জায়গাটি বেছে নিতে পারেন।

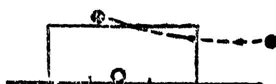






চিত্র ৭১ ॥ বলের গতিপথ অনুযায়ী গোলরক্ষকের দাঁড়াবার জায়গা বেছে নেওয়া উপরে) অতিরিক্ত কোনাকুনি থেকে ; (মাঝে) মাঝামাঝি কোণ থেকে, (নিচে) সামনাসামনি।





চিত্র ৪২ ॥ গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ঠিক করা. (ক) যেক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। (খ) বেরিয়ে আসা উচিত নয়।

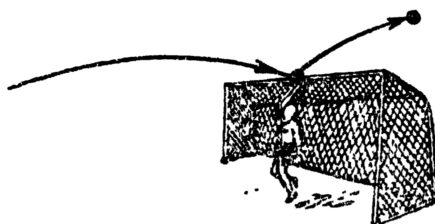
কোন্ জায়গা থেকে শট্ মারা হচ্ছে সেই অনুযায়ী গোলরক্ষক জায়গা বেছে নেন। মাঠের যতো কোনাকুনি জায়গা থেকে গোলে বল মারা হবে গোলরক্ষক সেই খেলোয়াড়ের নিকটতম গোল পোস্টের দিকে ততখানি ঘেঁষে দাঁড়াবেন, এতে গোল দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়বে (চিত্র ৪১)। যত সামনা-সামনি বল আসবে তত বেশি গোল হবার সম্ভাবনা।

কোনো আক্রমণ ঠেকাবার জন্য দৌড়ে যাবার মুহূর্তটি বেছে নেওয়া। বিপক্ষের আক্রমণকারীর পা থেকে যেই বলটি মেরে দেবার পর বেরিয়ে এল ঠিক সেই মুহূর্তটিই গোলরক্ষকের দৌড়ে যাবার পক্ষে সেরা সময়। মনে থাকা দরকার যে আক্রমণ-কারীর তুলনায় গোলরক্ষক অর্ধেক সময়ের মধ্যে বল পান কারণ বলটি তাঁর দিকেই ছুটে আসছে।

কোনো আড়াআড়ি শট্ ধরবার জন্য দৌড়োবার মুহূর্ত বেছে নেওয়া। এক্ষেত্রে গোলরক্ষক যদি বল আটকে দিতে পারবেন বলে নিশ্চিত হন তাহলেই তিনি দৌড়ে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু যদি দেখেন যে প্রতিরোধ করতে নিজের কোনো খেলোয়াড় বলের দিকে ছুটে যাচ্ছেন তাহলে অরক্ষিত অবস্থায় গোল ছেড়ে দৌড়ে যাওয়ার চেয়ে গোলে থাকাই বরং ভালো,

কারণ এ সময়ে সেই বল কাড়াকাড়ির ফল ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে (চিত্র ৪২)।

বল ক্যাচ ধরবার কায়দা ঠিক করা—বল যদি গোলরক্ষকের কোমর থেকে উঁচুতে ও মাথার চেয়ে নিচের দিকে ছুটে আসে তা হলে তিনি লাফ দিয়ে তা ধরে পেটের উপর টেনে আঁকড়ে নেবেন। বল যদি ক্রস্ বারের (গোলের উপরকার আড়াআড়ি দণ্ড) ঠিক নিচুতে ছুটে



চিত্র ৪৩॥ ক্রস্-বারের ওপর দিয়ে ঘুষি মেরে বল পার করা

আসে ও তা ধরার অসুবিধা হয় তবে তাকে ঘুষি মেরে গোল পার করে দিতে পাবেন (চিত্র ৭৩)।

বল কোনো কোনো সময় এত তাড়াতাড়ি ছুটে আসে যে গোলরক্ষক তাকে কোনো রকমে সামলাতেই শুধু পারেন। এসব ক্ষেত্রে বল ঘুষি দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

ফুল-ব্যাকের ব্যক্তিগত কৌশল

জায়গা বেছে নেওয়া। আক্রমণকারী যাতে বল ধরতে না পারেন তা বুঝেই ব্যাকের খেলোয়াড় তাঁর অবস্থান বেছে নেবেন। কখনো কখনো প্রতিপক্ষকে পায়ে পায়ে সব জায়গায় অনুসরণ করবার দরকার হয়, কখনো বা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থেকে খেলা যুক্তিযুক্ত—অর্থাৎ নিজের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। প্রতিপক্ষ যাতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারেন এভাবেই ব্যাকের খেলোয়াড়কে বল পেতে চেষ্টা করতে হবে।

বল কাড়াকাড়ি শুরু করবার মুহূর্ত বাছাই—প্রতিপক্ষের যে ব্যক্তির কাছে বল আছে তার দিকে ব্যাকের খেলোয়াড়ের সতর্ক নজর রাখা চাই এবং বল কাড়াকাড়ি করতে এগিয়ে যাবেন না পিছিয়ে পড়বেন তা

চটপট ঠিক করে ফেলা চাই। আক্রমণকারী কখন প্রথম বল মারবেন তার জন্য ব্যাক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়ে অপেক্ষা করবেন।

বল কাড়াকাড়ির পদ্ধতি ঠিক করা। যিনি বিপক্ষের খেলোয়াড়কে প্রতিরোধ করবেন তাঁকে খেলার পরিস্থিতিটা যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে ও বল কাড়াকাড়ি করার চেষ্টা করলে কি ফল দাঁড়াবে তা তাঁর আগে থাকতে জানা চাই। এই অবস্থা বোধের মধ্য থেকেই তাঁর ট্যাক্‌ল্ করে খেলবার পদ্ধতিটি বেরিয়ে আসবে। খেলোয়াড় এক পা দিয়ে ট্যাকল্ করে, কাত হয়ে ট্যাকল্ করে (স্লাইডিং) অথবা উভয় পা দিয়ে বল ঠেকিয়ে,ইত্যাদি নানা কায়দায় খেলতে পারেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোন্ দিকে চালিত করতে হবে তা স্থির করা। ব্যাকের খেলোয়াড়কে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়টির মতলব আন্দাজ করে নিতে হবে, এবং টাচ্‌লাইনের দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে মাঠের কেন্দ্রের দিকে তার আসার পথ বন্ধ করতে হবে।

কোনো আক্রমণ ভেঙে দেওয়া। কোনো সঙ্কটজনক অবস্থায় বল ধরতে পারা কঠিন বোধ হলে গোলের দিক থেকে দূরে বল কিক্ মেরে সরিয়ে দেওয়া দরকার। যদি বল থামাবার সম্ভাবনা থাকে তবে তা থামিয়ে তিনি তাঁর সহযোগী খেলোয়াড়কে সঠিকভাবে পাস্ করে দেবেন।

হাফব্যাকের ব্যক্তিগত কৌশল

খেলা শুরু করবার ঠিক সময়টি ও অবস্থান বেছে নেওয়া। খেলায় আত্মরক্ষার সময়ে হাফব্যাককে তাঁর প্রতিপক্ষীয় নির্দিষ্ট খেলোয়াড়টির পাশে অবস্থান ঠিক করে নিতে পারা চাই এবং প্রতিপক্ষের বল ঠেকিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার উদ্দেশ্যে তাঁর আওতা থেকে ঠিক কোন্ মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হবে তা বুঝে নেওয়া চাই।

কী করতে হবে স্থির করা। হাফব্যাকের সব সময়ে জানা থাকা চাই তিনি আক্রমণ না আত্মরক্ষা করতে চলেছেন। প্রতিপক্ষ কখন আক্রমণ শুরু করছে ও কোন্ মুহূর্তটিতে তাদের কাছ থেকে বল হাতছাড়া হচ্ছে এবং তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হচ্ছে, আগে থাকতেই তাঁকে তা ধরে নিতে পারা চাই।

আক্রমণের প্রধান গতিপথ আন্দাজ করে নেওয়া। আক্রমণের প্রধান গতিপথটি ঠিক করে নিয়ে খেলোয়াড় এমন কোনো টিম-সঙ্গীর কাছে বলটি এগিয়ে দেবেন যাতে তিনি তা ঠিক ঠিক পেয়ে যান।

ফরোয়ার্ড দলের সঙ্গে যোগ দেবার সময় স্থির করা। আত্মরক্ষার সময়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারবেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই হাফব্যাকের খেলোয়াড় এলাকার সীমারেখার বাইরে এগিয়ে গিয়ে খেলায় যোগ দিতে পারেন।

ফরোয়ার্ডের ব্যক্তিগত কৌশল

কী করতে হবে স্থির করা। বিপক্ষের গোলের কাছে পৌছে ফরোয়ার্ডকে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করতে হবে, বল তাঁর সহযোগী খেলোয়াড়ের কাছে এগিয়ে দেবেন, না নিজেই এগিয়ে গিয়ে গোলে বল মেরে দেবেন।

বলটি থামিয়ে দিতে হবে অথবা কোনো সহযোগী খেলোয়াড়ের কাছে এগিয়ে দিতে হবে অথবা নিজেই গোল করতে চেষ্টা করতে হবে ফরোয়ার্ডকে তা অবশ্যই স্থির করে নিতে হবে।

কোন্‌দিকে যেতে হবে স্থির করা। আক্রমণ কোন্‌দিক থেকে হচ্ছে ফরোয়ার্ড তা বুঝে নিয়েই সে দিকে যাবার চেষ্টা করবেন, কারণ তা না হলে তিনি যদি বলটি নাও পান তবুও বিপক্ষের রক্ষণ-দলের খেলোয়াড়দের মনোযোগ নষ্ট করে দিতে পারবেন। প্রান্তভাগের খেলোয়াড়ের ('উইঙ্গার') পক্ষে এটা বিশেষ করে দরকার। তাঁকে চটপট করে স্থির করতে হবে পেনাল্টি এলাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত, না টাচ্‌ লাইন ধরে গোল লাইনের দিকে গিয়ে গোলের মুখে 'হ্যাঙ্গিং শট' দিয়ে কিংবা সোজাসুজি বলটি গোলে মেরে দেওয়া উচিত।

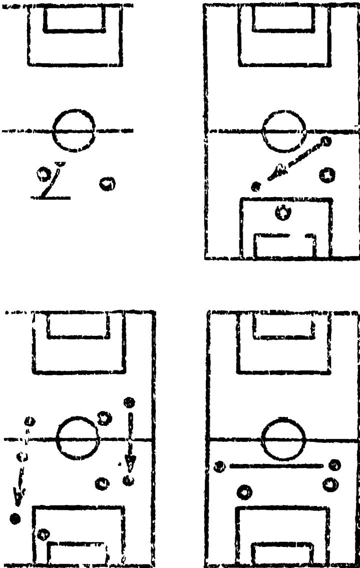
ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়ের দূরত্ব অনুমান করবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং উপযুক্ত জোরের সঙ্গে বলটি মারা চাই, যাতে করে বলটি তার দলের খেলোয়াড়ের কাছে পৌছে যেতে পারে।

দলগত কলাকৌশল

বল পাস্ করা ও সমবেত তৎপরতা

খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কলাকৌশল হওয়া চাই সমগ্রভাবে টিমের কলাকৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক সহযোগে। 'টিম-ওয়ার্ক' মানেই যথেষ্ট পরিমাণে বল পাস্ করা ; প্রত্যেকটা পাস্ই অত্যন্ত নির্ভুল হতে হবে।

মধ্য-রেখা (হাফ্ওয়ে-লাইন)-এর বরাবর সমান্তরালভাবে পাস্ করাকে বলে 'ক্রস্-পাস্' ; টাচ্-লাইন বা সীমারেখা বরাবর মধ্যরেখার আড়াআড়ি লম্বভাবে পাস্ করাকে বলে 'ফরওয়ার্ড' পাস্; এ ছাড়াও আছে কোনাকুনি বা 'ডায়গনাল পাস' (চিত্র ৪৪)।



চিত্র ৪৪ ॥ পাসের বিভিন্ন ধরন : (উপরে, বাঁদিকে) ক্রস পাস্ ; (উপরে ডান দিকে) ফরোয়ার্ড পাস্ ; (নিচে বাঁদিকে) কোনাকুনি পাস্ ; (নিচে ডানদিকে) হুক্-পাস্।

বল পাস্ সরল-রেখাতেও হতে পারে, বাঁকা রেখাতেও হতে পারে (৪৪ নং ছবি দেখুন)। বাঁকা রেখায় পাস্ করতে হলে পায়ের পাতার পিঠের ভেতর দিক বা বাইরের দিক দিয়ে ট্যারচা কিক্ করতে হয়।

পর পর একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের পাস্কে এক সহযোগে চালাতে পারলে তাকেই বলা হয়ে থাকে সমবেত তৎপরতা (কম্বাইণ্ড মুভমেন্ট)।

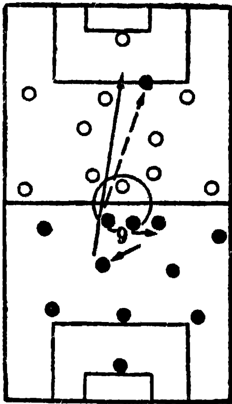
দু' তিন, চার কি আরো বেশি খেলোয়াড় নিয়ে কম্বাইণ্ড

মুভমেণ্ট হতে পারে। দু' তিনজন কি তারো বেশি খেলোয়াড়কে নিজেদের ভেতর একসঙ্গে থেকে পাস্ করার কৌশল শিখে নিতে হবে।

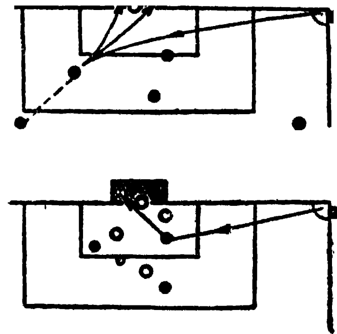
দু' তিনজন খেলোয়াড় পাশাপাশি একসঙ্গে তৎপর হয়ে খেলতে থাকলেও তাঁদের খেলার ধরনে হয়তো অনেকটাই অমিল থাকতে পারে। তাঁদের খেলাটা হয়তো মাঠের সেণ্টারে বা বিপক্ষের গোলের কাছে চলছে—এ অবস্থায় গোলের দিকে সোজা বল পাঠিয়ে দিয়ে খেলা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। নয়তো এতে কোনো ফলই হবে না।

কতকগুলো বাঁধা-ধরা অবস্থান থেকে খেলা

প্র্যাকটিসের গোড়াতেই টিমকে শিখতে হবে কীভাবে ফুটবলের কয়েকটি বাঁধা-ধরা অবস্থান (পজিশন) থেকে সমবেত তৎপরতা শুরু করা যায়। এ অবস্থানগুলো হল: (ক) কিক্ করে বল পাঠানো, (খ) কর্নার কিক্, (গ) ফ্রি-কিক্ ও (ঘ) থ্রো। এখানে যে সব মুভমেণ্ট (চাল) বা গতিবিধি নিয়ে আলোচনা হবে তা রক্ষণ বা আক্রমণ দু' ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য।



চিত্র ৪৫॥ কিক্-অফ্ চাল: —বলের গতিপথ;···খেলোয়াড়ের গতিপথ। সাদা ও কালো বিন্দু দু' পক্ষের খেলোয়াড়।



চিত্র ৪৬॥ কর্নার কিকে সমবেত তৎপরতা।

১। কিক্ করে বল পাঠিয়ে দেবার পর বিপক্ষের গোলের কাছে তাড়াতাড়ি পৌছুবার জন্য, কিংবা সম্ভব হলে গোলের দিকে বল মারবার জন্য নানা ধরনের গতিবিধি শুরু করা যেতে পারে। যতক্ষণ সম্ভব

বিপক্ষের মাঠের দিকেই বলটাকে চেপে রাখতে হলে অথবা মাঠের ওপর দখল বিস্তার করতে হলে নানারকম কায়দা নিতে হতে পারে।

এই বিশেষ মুভমেন্টের একটা উদাহরণ দেওয়া হল (চিত্র ৪৫): সেণ্টার ফরোয়ার্ড (৯নং ব্যক্তি) বলটাকে পাস্ করে দিলেন ইন্সাইড রাইটের কাছে, এদিকে লেফট্ ইন তখন সবেগে ছুটে গেছেন বিপক্ষের পেনাল্টি-গণ্ডির দিকে। রাইট-ইন বল পাস্ করে দিলেন লেফট্-হাফকে। লেফট্-হাফ আবার লম্বা পাস্ করে বল পাঠিয়ে দিলেন বিপক্ষের পেনাল্টি-সীমানায় যেখানে তাঁদের লেফট্-ইন আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

২। কর্নার-কিকেও নানা রকম গতিবিধি হতে পারে খেলোয়াড়দের। সাধারণত যা করা হয় তা হল গোল-সীমানার দূরবর্তী প্রান্তের দিকে বলটাকে সোজা কিক্ করে পাঠানো (৪৬নং চিত্র, ওপরের ছবি)। সবচেয়ে ভালো হয় বলটাকে গোল ঘেঁষে কিক্ করলে, তা বলে এত কাছে নয় যে গোলরক্ষক বলটাকে আটকে ফেলুক। ফরোয়ার্ডরা বল ধরে কিক্ করবেন অথবা হেড্ করবেন, কারণ এ অবস্থায় বল সাধারণত দশফুট উঁচু দিয়ে যায়।

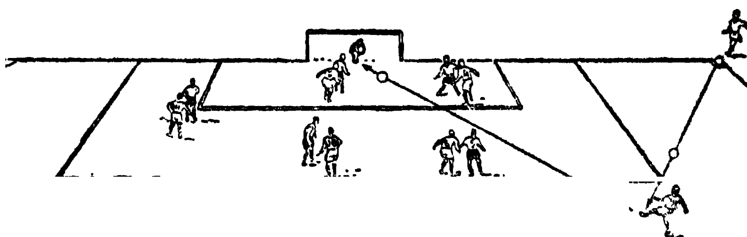
বলটাকে নিকটবর্তী (কর্নারের দিককার) গোল-পোস্টের দিকেও পাস্ করা চলে, অর্থাৎ কর্নার-পতাকার সবচেয়ে কাছে যেসব খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দিকে—বিশেষ করে বল যদি ভিজে ও পিছলে থাকে তাহলে এই ধরনের পাস্ ফলপ্রদ (৪৬নং নিচের ছবি)। এ অবস্থায় ফরোয়ার্ডকে শুধু মাথা অথবা পা দিয়ে বল ঠেকাতে হবে, বলটা তখন প্রত্যাঘাত পেয়ে নেটের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

বল যদি নিচু হয়ে আসে তা হলে ফরোয়ার্ড হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে পায়ের তলা দিয়ে বলটাকে চলে যেতে দিলেন। কর্নার কিকের জন্য অন্য খেলোয়াড়রা যাঁরা ওত পেতে ছিলেন তাঁদের এমনি ধরনের ছলাকৌশলের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই।

ইদানীংকালে কর্নার-পতাকার দিকে থেকেই সোজাসুজি পাস্ করার রেওয়াজ হয়েছে। এর যে সমস্ত হের-ফের হতে পারে তা নিচে বলা হল :

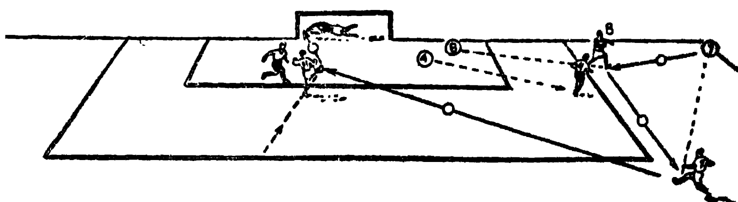
(ক) খেলোয়াড় কোনাকুনি কিক্ করে পেনাল্টি-গণ্ডির বাইরের কোণের দিকে নিজ দলের একজন হাফব্যাককে অথবা ব্যাককে লক্ষ্য করে বল

পাঠাবেন। হাফব্যাক বা ব্যাক সেইদিকেই ছুটে আসছিলেন। উনি বলটিকে তখন হয় গোলের গণ্ডির মধ্যে ঠেলে দেবেন নয়তো সোজা গোলের দিকে মেরে দেবেন (চিত্র ৪৭)। এই চালটা হওয়া চাই খুব আকস্মিকভাবে; পরের বার হয়তো বিপক্ষ দল এইটেই আবার প্রত্যাশা করতে থাকবেন।



চিত্র ৪৭ ॥ কর্নার কিক্ (রকমফের)

(খ) বলটাকে ধরবার জন্য একজন ফরোয়ার্ড তাড়াতাড়ি ছুটে গেছেন (কর্নার-পতাকা থেকে প্রায় গজ বারোর মধ্যে), ওদিকে যে খেলোয়াড়টি বল পাস্ করেছিলেন তিনি ততক্ষণে পেনাল্টি-গণ্ডির কোণের দিকে সরে এসেছেন। বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় যেই বল ধরতে এল অমনি বলটাকে ফের পাস্ করে দেওয়া হল যিনি কর্নার কিক্ করেছিলেন তাঁর দিকেই উনি তখন হয় বলটাকে গোলের মধ্যে শুট্ করলেন, নয়তো নিজেরই দলের



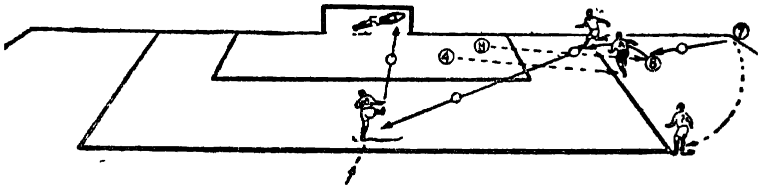
চিত্র ৪৮ ॥ কর্নার কিক্ (রকমফের)

কেউ আরো ভালো অবস্থানে আছে বুঝতে পেরে তাঁর দিকে পাঠিয়ে দিলেন (চিত্র ৪৮)।

(গ) এই গতিবিধিটাই আরো জটিল হতে পারে। বিপক্ষের ব্যাক যিনি বলটাকে আটকাতে চেষ্টা করছেন তাঁকে ঠকানো চলে। পাস্ করে

বল ফিরিয়ে না দিয়ে খেলোয়াড় হয়তো বলটাকে ঘুরিয়ে বিপক্ষের পাশ কাটিয়ে নিয়ে গোলের দিকে মেরে দিলেন (চিত্র ৪৯)।

এই কায়দায় যতটা সম্ভব গোল-গণ্ডির কাছাকাছি ঘেঁষে বল পাস্ করার প্রয়োজন হবে, অল্প খানিকটা জায়গার মধ্যে আক্রমণকারীদের সকৌশলে খেলা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই বিশেষ কায়দাটি অবশ্য আগের মতো আকস্মিকভাবে করার প্রয়োজন হবে না; কর্নার-পতাকার দিকে যে খেলোয়াড়টি ছুটে যাচ্ছেন তিনি বেশ জানেন যে তাঁর পেছু নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়টি আন্দাজই করতে পারবেন না তিনি বলটাকে পাস্ করবেন, না নিজেই বল নিয়ে ছুটবেন।



চিত্র ৪৯ ॥ কর্নার কিক্ (রকমফের)

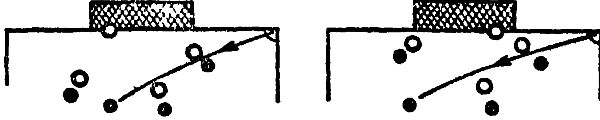
কর্নার কিক্ কীভাবে করবেন তা ফরোয়ার্ডকে ভেবে ঠিক করতে হবে—(যে কোনো একটি পা দিয়ে) ট্যারচা মার দিতে পারেন, সোজা কিক্ করে গোলের দিকে পাঠাতে পারেন, কিংবা টিমের সঙ্গীকে পাস্ করে দিতে পারেন; মোট কথা, যে কোনো বিশেষ কিকের বেলাতেই তিনি বিভিন্ন খেলোয়াড়দের অবস্থানটা বুঝে নেবেন।

ফরোয়ার্ডদের সম্পর্কেও এ-কথাই খাটে। কর্নার কিকের সময় রক্ষণ-ভাগের খেলোয়াড়দের প্রত্যেকে অপর পক্ষের প্রত্যেককে জনে-জনে নজরে রাখবেন। এ অবস্থায় বিপক্ষের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড়টির দিকে এপক্ষের লম্বা খেলোয়াড়রা নজর রাখবেন। আক্রমণ 'ভেঙে দেবার' জন্য বিশেষ করে ব্যাকদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ ছাড়াও, ব্যাকরা যেন কোনোক্রমেই নিজেদের গোলরক্ষকের চলা-ফেরায় বাধা সৃষ্টি না করেন; আত্মরক্ষার সময়ও তিনিই খেলোয়াড়দের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবেন। বলের গতিপথের মধ্যে থাকলে কোনো ব্যাকেরই উচিত নয় বল হাত ছাড়া করা। যত অসুবিধাই থাক্ তবু বলকে

মাঝপথে আটকানো তাঁর কর্তব্য। কোনো ফরোয়ার্ড পায়ের তলা দিয়ে বল চলে যেতে দিলেন কিনা সেদিকে তিনি খেয়াল রাখবেন।

প্রত্যেক রক্ষণ-খেলোয়াড় দাঁড়াবেন তাঁর নজরে রাখা বিপক্ষের লোক ও নিজেদের গোলের মধ্যস্থলে, সেই লোকটির খুব কাছাকাছি।



চিত্র ৫০ ॥ কর্নার কিকের সময় গোলরক্ষকের অবস্থান ; (ক) সঠিক পদ্ধতি (খ) ভুল পদ্ধতি।

কর্নার-কিকের সময় গোলরক্ষক দাঁড়াবেন পেছনের দূরবর্তী গোলপোস্টটির কাছে যাতে তিনি সেখান থেকে পুরো গোল-এলাকা ও বেশির ভাগ খেলোয়াড়কেই নজরে রাখতে পারেন (চিত্র ৫০)।

৩। ফ্রি-কিক্ ও পরোক্ষ কিকের মধ্যে পার্থক্য যেমন খুবই কম, তেমনি রক্ষণভাগ ঠিকমতো সংগঠিত থাকলে এ দু'ধরনের কিকে ফলও বিশেষ পাওয়া যায় না।

সোজা গোলের দিকে মারার যদি সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকে তা হলে ফ্রি-কিক্ মারাই সঙ্গত, আর পরোক্ষ ফ্রি-কিক্ করতে হলে বলটাকে চট্ করে কাছাকাছি কোনো সাথীকে পাস্ করে দিতে হবে যাতে তিনি তৎক্ষণাৎ গোলের দিকে বল শুট্ করতে পারেন।

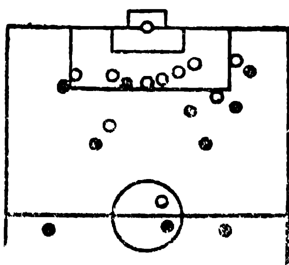
বলের রাস্তা বন্ধ করবার জন্য রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা সাধারণত চার কি পাঁচজনকে পাশাপাশি লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেন (চিত্র ৫১)। যাঁরা লাইনে দাঁড়াবেন তারা সাধারণত খেলার আগেই নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে নেন। লাইন গড়া হয় তখনই যখন বল্টাকে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকে কিক্ করলে সোজাসুজি শুট্ করে গোলে পাঠানোর আশঙ্কা আছে। বাদবাকি খেলোয়াড়রা সেই সময় তাঁদের যাঁর যাঁর বিপরীতের খেলোয়াড়দের আগলে রাখেন, আর কর্নার-কিকের মতো এক্ষেত্রেও আক্রমণকারীদের চোখে-চোখে রাখেন।

আত্মরক্ষার জন্য গোটা টিমকেই দাঁড় করানো হয়। শুধু একজন খেলোয়াড় থাকেন মাঠের মাঝখানে, তিনি সবুর করতে থাকেন যদি কোনো

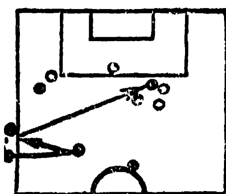
মুহূর্তে আক্রমণকারীদের আক্রমণ ভেঙে গিয়ে বল এপাশে চলে আসে তাহলে তিনিই বিপক্ষের গোলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আত্মরক্ষার প্রাচীর ভাঙবার জন্য আক্রমণকারী লাইনের মধ্যেকার খেলোয়াড়দের খুব কাছাকাছি থাকবেন যাতে তারা একটু ভুল চাল দিয়ে খেললেই সে সুযোগ আক্রমণকারীরা নিতে পারেন।

কোনো অলক্ষিত খেলোয়াড়ের দিকে তাঁরা বলটা পাস্ করে দিতে পারেন অথবা বিপক্ষের সারিবদ্ধ খেলোয়াড়দের মাথার ওপর দিয়ে কিক্ পাঠাতে পারেন যাতে সেখানকার অপেক্ষমান খেলোয়াড়রা গোল করার চেষ্টা করে খেলা শেষ করতে পারেন। ফ্রি-কিক্ নেবার জন্য নানা রকম কৌশল খাটানো যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন খেলোয়াড় হয়তো বল থামালেন কিন্তু মারলেন আরেকজন, অথবা একজন বলের দিকে দৌড়ে গিয়ে বল লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেলেন, আর আরেকজন কিক্ করলেন, ইত্যাদি।



চিত্র ৫ ॥ ফ্রি-কিকে রক্ষণ-ভাগের সারিবদ্ধ অবস্থান।



চিত্র ৫২ ॥ 'থ্রো'-এর সময় সমবেত তৎপরতা।

অবশ্য মনে রাখা চাই যে এ ধরনের কিক্ করা হয় কেবলমাত্র থেমে-থাকা বলেই, সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলকে আগে মাটিতে দাঁড় করিয়ে নিয়ে তবে কিক্ করতে হবে।

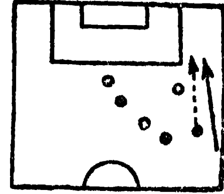
৪। একবার থ্রো করার পর নানা ধরনের গতিবিধি বা চাল হওয়া সম্ভব। যে খেলোয়াড় বল ছুঁড়ছেন তাঁকে কুড়ি গজ বা তারও বেশি থ্রো করতে পারা চাই—সম্ভব হলে সিধে গোল সীমানার মধ্যেই ছুঁড়ে দেবেন, সেখান থেকে বল কিক্ করে বা হেড্ করে সোজা গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।

'থ্রো'-এর চালগুলো মোটামুটি এই ধরনের : বলটিকে হয়তো ছুঁড়ে দেওয়া হল দলেরই একজন সাথীর পায়ের দিকে অথবা মাথায়, তিনি আবার

এমনভাবে সেটা পালটা ফিরিয়ে দিলেন যাতে ফের প্রয়োজনমতো দিকে কিক্ করে বল পাঠানো যায় (চিত্র ৫২)।

আবার অন্য ধরনেরও চাল আছে যাতে খেলোয়াড় বলটিকে ধরার ভান করেন বটে কিন্তু আসলে পাস্ করে দেন আরেকজন খেলোয়াড়ের দিকে।

বল থ্রো করার পরেই, যাকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া হল সেই খেলোয়াড়টি দ্রুত বল কাটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। খেলোয়াড় যখন বলটি থ্রো করতে যাচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর টিমের সাথী বিপক্ষের পাশ কাটিয়ে দৌড়ানো অবস্থাতেই বল ধরে ছুটবেন।



চিত্র ৫৩॥ 'থ্রো'-এর নিশানা।

স্বপক্ষের মাঠের দিকে কোনো ব্যাককে উদ্দেশ্য করে বল থ্রো করা ঠিক নয়, কারণ তিনি হয়তো ধরতে পারলেন না কিংবা সঠিক দিকে বল পাঠাতে পারলেন না, তখন গোটা টিমের অবস্থাই খারাপ হয়ে দাঁড়াবে।

টাচ্-লাইন বরাবর বল থ্রো করাই সবচেয়ে নিরাপদ (চিত্র ৫৩)। যদি খেলোয়াড়ের নিজস্ব গোল-সীমানার কাছাকাছিই থ্রো করতে হয় তাহলে বল সরাসরি গোলরক্ষককেও দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কাছাকাছি কোনো বিপক্ষ-খেলোয়াড় থাকলে সেটা করা উচিত হবে না।

যে মুহূর্তে মাঠে বল চালু হয় ঠিক তখন থেকেই শুরু হয় এইসব বিভিন্ন ধরনের গতিবিধি বা চাল (মুভমেণ্ট)। খেলা যখন চলছে সেই অবস্থাতেই বেশির ভাগ চালগুলো চালতে হয়, এবং এইটেই হয় সবচেয়ে কঠিন কাজ। প্রত্যেকটা চালের প্রকৃতি কি হবে তা নির্ভর করে খেলার বিশেষ পরিস্থিতির ওপর।

খোলা জায়গা বেছে নেওয়া ও বিপক্ষকে পাহারা দেওয়া

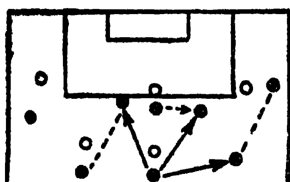
নিজস্ব টিমের অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পাসের বল ধরবার আগে যে কোনো খেলোয়াড়েরই কাজ হল বিপক্ষের যে লোকটি তাঁর ওপর নজর রাখছে তাকে এড়ানো। এর জন্য প্রয়োজন তাড়াতাড়ি একটা খোলা জায়গায় দৌড়ে গিয়ে বল ধরা।

আক্রমণ কৌশলের একটি চালই হল খোলা জায়গা বেছে নেওয়া। যে টিমের হাতে বল নেই তাদের চেষ্টা হবে বিপক্ষ যাতে বিনা বাধায়

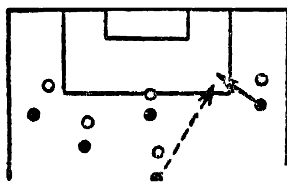
নিজেদের মধ্যে বল পাস্ করতে না পারে তাই তাদের আগলে রাখা বা আটকানো।

বল ধরতে হোক বা না হোক, সব খেলোয়াড়েরই কর্তব্য হল খোলা জায়গা বেছে নেবার চেষ্টা করা (চিত্র ৫৪)।

এসব ক্ষেত্রে বল কোন্ দিকে পাস্ করতে হবে ?

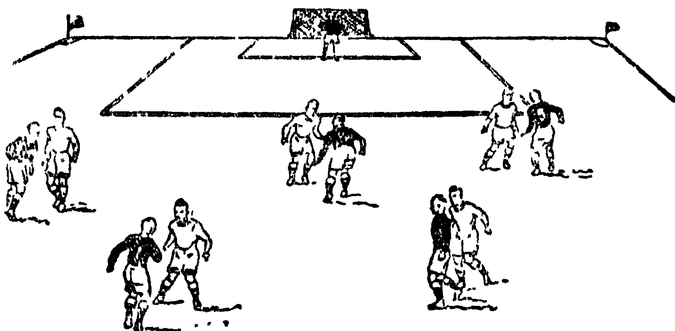


চিত্র ৫৪ ॥ বল ধরবার জন্য ফরোয়ার্ডদের খোলা জায়গা বেছে নেওয়া।



চিত্র ৫৫ ॥ খোলা জায়গায় বল পাস্ করা।

বল সরাসরি পাঠাতে হবে এমন কোনো সহযোগীর দিকে যার ওপর কোনো পাহারা নেই, অথবা এমন একটি খোলা জায়গার দিকে যেখানে সহযোগীকে দৌড়ে গিয়ে বল ধরতে হবে (চিত্র ৫৫)। শেষোক্ত কাজটির জন্য চাই সঠিক মুহূর্তে ও সঠিক নিশানায় পাস্ করা। যে খেলোয়াড় বল ধরবেন তাঁকেও ঠিক সময়মতো দৌড়োতে হবে, নয়তো সেই জায়গায় তাঁর আগেই বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় গিয়ে হাজির হতে পারেন।

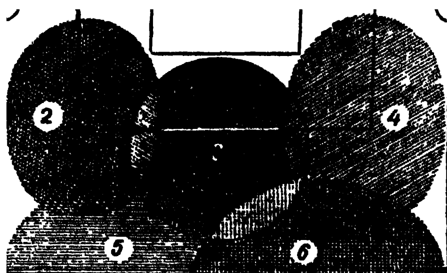


চিত্র ৫৬। পাহারা দেওয়ার পদ্ধতি।

বিপক্ষকে পাহারা দেবার বা নজরে রাখবার পদ্ধতিগুলো সাধারণত এই ধরনের :

প্রথম পদ্ধতি। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাঁর নিজের মাঠের ওপর প্রতিপক্ষের বিশেষ একেকজন খেলোয়াড়ের ওপর আগাগোড়া নজর রাখবেন (চিত্রে ৫৬)। প্রতিপক্ষ যখন তার নিজস্ব মাঠে ফিরে যাবে তখন আর তাকে অনুসরণ না করলেও চলবে; কিন্তু মাঠের মধ্যবর্তী রেখাটি সে যেই আবার পার হয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে 'পেছনে লেগে-থাকা'। বিপক্ষ থেকে পরস্পরের দূরত্ব থাকা চাই তিন থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত। একে বলা যেতে পারে 'জনে-জনে নজর রাখা'।

দ্বিতীয় পদ্ধতি। খেলোয়াড়রা এক্ষেত্রে একেকটি বিশেষ এলাকার



চিত্র ৫৭॥ "এলাকা রক্ষায়" ফুলব্যাক ও হাফব্যাকরা যে সব গণ্ডিতে থাকবেন।

পাহারায় থাকেন ও এই এলাকার মধ্যেই বিপক্ষের সঙ্গে বল কাড়াকাড়ি করে থাকেন। একে বলা হয় 'এলাকা রক্ষা' বা জোন্ ডিফেন্স। (চিত্র ৫৭)।

তৃতীয় পদ্ধতি। এটাই হল পাহারার সবচেয়ে জটিল পদ্ধতি। 'জনে জনে নজর রাখা' ও 'এলাকা রক্ষা'—এই দুটো পদ্ধতির সমন্বয় এটা। এতে প্রত্যেক খেলোয়াড় বিপক্ষের একেকজনের ওপর নজর রাখেন, কিন্তু বিপক্ষ যদি হঠাৎ তাদের খেলোয়াড়দের অবস্থান পাল্টে ফেলে তাহলে তিনি তাঁর নজরে রাখা প্রতিপক্ষকে অপর এক সাথীর জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে নিজে আরেকজনকে পাহারা দিতে শুরু করেন।

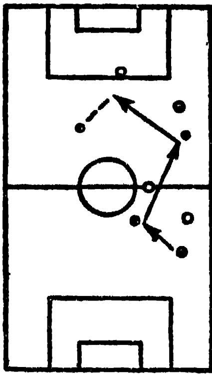
অবস্থান বা পজিশন বদল করার চাল খুবই দুরূহ, কারণ এতে উঁচু দরের টিম-ওয়ার্ক প্রয়োজন। টিম যখন আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণের দিকে ঝোঁকে তখন খেলোয়াড়রা স্থান বদল করতে পারেন। বিপক্ষ যখন আক্রমণ

শুরু করে দিয়েছে তখন স্থান বদল করা ঠিক নয়। এ ধরনের পাহারা দিতে পারা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচায়ক। বিশেষ করে "তিন-ব্যাক" প্রথায় খেলবার সময় স্থান বদল করবার দক্ষতা না থাকলেই নয়।

স্থান বদল করা

বিপক্ষের পাহারা ভেঙে চলে আসার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়রা তাঁদের টিমের সাথীদের সঙ্গে জায়গা অদলবদল করে নেন। এই অদলবদল প্রায়ই ঘটানো হয়ে থাকে বিপক্ষকে ঘাবড়ে দেবার জন্য ও মাঠের কোনো বিশেষ অংশে তাদের তুলনায় নিজেদের খেলোয়াড়দের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখবার জন্য। গোটা টিমের সহযোগিতায় কাজটা খুব ভালোভাবে হয়, ও এতে যথেষ্ট দ্রুততার প্রয়োজন হয়।

ফরোয়ার্ডদের অবস্থান বদলানোটাই যে সবচেয়ে বড়ো কথা তা নয়। টিমের সমস্ত খেলোয়াড়দেরই অবস্থা বুঝে জায়গা বদলানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে। একেই বলা হয় হয়ে থাকে "বল বাদ দিয়ে খেলা"। মাঠের মধ্যে এমন একজনও খেলোয়াড় থাকবেন না যিনি শুধু দাঁড়িয়ে খেলা দেখবেন। ফরোয়ার্ডরা যদি বিপক্ষের পেনাল্টি গণ্ডির মধ্যে ঢুকে গোল আক্রমণ করতে থাকেন তখন ব্যাকদেরও উচিত হবে মাঠের মধ্যরেখা অবধি আসা, এমন কি প্রয়োজনবোধে তা ডিঙিয়ে যাওয়া। এক প্রান্তভাগে (উইং) যখন আক্রমণ চলছে তখন অন্য প্রান্তভাগের খেলোয়াড়দেরও জায়গা মতো তৈরী থাকতে হবে সম্ভাব্য কোনো পাস্ বা গোলের দিকে শট্ ধরবার জন্য।



চিত্র ৫৮ ॥ এক-টানা" চালের পদ্ধতি।

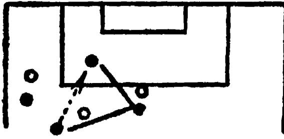
আক্রমণ ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে যাদের অংশ গ্রহণ করতে হয় সেই হাফ-ব্যাকরাই বেশির ভাগ সময় স্থান অদলবদল করে থাকেন। তাঁরা অনবরত আক্রমণ-ভাগ থেকে রক্ষণভাগে অথবা রক্ষণ থেকে আক্রমণে জায়গা বদল করেন।

"একটানা পাস্-এর খেলা

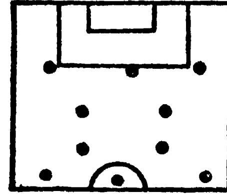
দু'তিনজন খেলোয়াড সমবেতভাবে চাপ দিয়ে বলটাকে পরস্পরের কাছে পাস্ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে সাধারণত বলটাকে আগে থামিয়ে

নিয়ে পরে একজন টিম-সঙ্গীর দিকে পাস্ করে দেওয়া হয় (চিত্র ৫৮)।

অবশ্য অনেক খেলোয়াড় তাঁদের টিম-সঙ্গীদের অবস্থান সম্পর্কে আগে থাকতে খেয়াল রেখে পা দিয়ে বলটিকে সোজাসুজি এক কিকেই একজন সঙ্গীর দিকে পাঠিয়ে দেন। অন্য কোন টিম-সঙ্গীর দিকেও বলটি একই রকম পাস্ করা চলে।



চিত্র ৫৯ ॥ "দেয়াল খাড়া করা" পদ্ধতি।



চিত্র ৬০ ॥ "তিন ব্যাক" প্রথায় খেলার বিন্যাস।

"দেয়াল খাড়া করে" খেলা

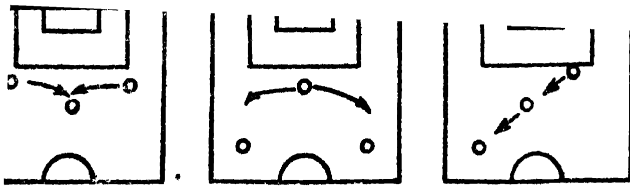
সোভিয়েট টিমগুলো প্রায়ই এ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। খেলোয়াড় তাঁর গন্তব্যস্থলের নিশানা স্থির করে নিয়ে একজন টিম-সঙ্গীকে নির্ভুলভাবে বলটা পাস্ করে দেন। তিনি যখন দৌড়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁর দৌড়োবার পথেই ফের বলটাকে কিক্ করে পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে (চিত্র ৫৯)। এইভাবে বলটা টিম-সঙ্গীর পায়ে ঘা খেয়ে নির্ভুল গতিতে ফিরে আসে এমনভাবে যেন একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।

খেলার বিভিন্ন প্রথা

"তিন-ব্যাক" প্রথায় খেলার ব্যাপক প্রচলন আছে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনুসারে নাম হয়েছে "তিন ব্যাক" প্রথা। ৬০ নং ছবিতে এই প্রথায় কীভাবে মোটামুটি খেলোয়াড়দের সাজানো হয় তা দেখানো হল। (৩) হাফ ব্যাক, (৪) ফরোয়ার্ডরা।

প্রত্যেক সারির কাজ স্বতন্ত্র।

গোলরক্ষক। গোলরক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হল গোল বাঁচানো। তিনিই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি পেনাল্টি গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে বল ধরতে পারেন। খেলোয়াড়দের সারিগুলোকে তিনি তাঁর জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখতে পান বলে তাঁর কাজ হল রক্ষণভাগকে পরিচালনা করা। সেই জন্য গোলরক্ষক ও ব্যাকদের মধ্যে পুরোপুরি সমঝোতা থাকা দরকার। বিশেষ করে প্রয়োজন গোলরক্ষক ও সেণ্টার-ব্যাকের (৩ নং ব্যক্তি) মধ্যে



চিত্র ৬১ ॥ ব্যাকদের কভার করা : (ক) প্রান্তবর্তী খেলোয়াড়দের দিয়ে সেণ্টার ব্যাককে কভার করা; (খ) প্রান্তবর্তীকে কভার করা; (গ) কোনাকুনি আত্মরক্ষা।

সহযোগিতা। সেণ্টার-ব্যাককে প্রায়ই গোলকীপারের দিকে বল পাস্ করে দিতে হয়। যখন ফ্রী কিকের খেলা চলতে থাকে তখন গোলকীপারই খেলোয়াড়দের জায়গা মতো দাঁড় করান ও পরিচালনা করেন। অনেক সময় গোলরক্ষককেই খেলা শুরু করতে হয় প্রথম। সমস্ত খেলোয়াড়দের তিনি লক্ষ্য করেন ও বলের ওপর নজর রাখেন।

ফুলব্যাক। ডান (২ নং), মধ্য (৩ নং) ও বাম (৪ নং)—এই তিনজন ব্যাককেই গোল রক্ষা করতে হবে। এঁরা সাধারণত যথাক্রমে ১১ নং, ৯ নং ও ৭ নং ফরোয়ার্ড খেলোয়াড়দের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করে থাকেন। ব্যাকদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা পূর্ণমাত্রায় থাকা দরকার, একজন আরেকজনকে 'কভার' করা চাই। 'কভার' করার বিভিন্ন পদ্ধতি ৬১ নং চিত্রে দেখানো হল। কোনাকুনি সারিতে আত্মরক্ষার সময় ব্যাকরা কোনাকুনি লাইনে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে কভার করেন (চিত্র ৬১)। বিপক্ষের ফরোয়ার্ড যদি কোনো প্রান্তবর্তী (উইং) ব্যাককে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যান তাহলে সেণ্টার-ব্যাক তাঁর বল কাড়তে আসবেন;

সেণ্টার-ব্যাককে এড়িয়ে গেলে বল কাড়তে আসবেন আরেকজন উইং-ব্যাক।

সমস্ত ব্যাককেই কিক্ করতে হবে নির্ভুলভাবে। মাঝে মাঝে হয়তো টিম-সঙ্গীর দিকে ফরোয়ার্ড পাস্ করার পরেই আবার আড়াআড়ি পাস্ করতে হতে পারে।

সংকটজনক অবস্থায় গোলের দিকে মুখ করে হয়তো ব্যাককে স্থির করে ফেলতে হবে কীভাবে বলটাকে গোলরক্ষকের দিকে পাস্ করা যায়।

সময় সময় ব্যাক তাঁর কিকের হিসেবে ভুল করে গোলরক্ষকের পাশ কাটিয়ে বলটাকে সোজা তাঁর নিজের গোলের নেটেই ঢুকিয়ে বসেন। সেই জন্য সবচেয়ে ভালো হল বলটাকে গোলপোস্টের বাইরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে গোলরক্ষক সেখান থেকেই বল সংগ্রহ করে নেন।

হাফ-ব্যাক। হাফব্যাকদের প্রধান কাজ আত্মরক্ষা এবং তাঁরা বেশির ভাগ সময় সেই কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাঁদের আক্রমণভাগে সহায়তা করারও প্রয়োজন হয়।

হাফ-ব্যাকরা সাধারণত বিপক্ষের ইনসাইড-ফরোয়ার্ডদের পাহারা দিয়ে থাকেন। আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণের দিকে খেলার মোড় ফেরাবার কালে খেলার পরিস্থিতিটা তাঁদের বুঝে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। আত্মরক্ষার সময় হাফ-ব্যাক তাঁর নজরে রাখা প্রতিপক্ষটির ঠিক পেছনেই (এক কি দু গজ পেছনে) থাকবেন অর্থাৎ নিজের গোলের দিকে থাকবেন।

আক্রমণের সময় তিনি থাকবেন প্রতিপক্ষটির সামনে।

হাফ-ব্যাকরা তাঁদের নিজের দলের ইনসাইড-ফরোয়ার্ডদের খুব কাছাকাছি থাকবেন এবং খেলার সময় আগাগোড়া তাঁদের সঙ্গে মিলে কেন্দ্রভাগকে দখলে রাখবেন।

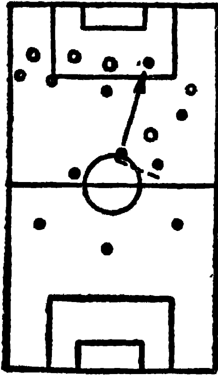
সময়-সময় হাফ-ব্যাকরা আক্রমণভাগের প্রথম সারিতেও যোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে কাজ তাঁরা করেন পালা করে—যখন তাঁরা নিশ্চিত থাকেন যে দলের সঙ্গীরা তাঁদের স্থান আগলে রেখেছেন (কভার করেছেন) তখনই শুধু একাজ করা হয়ে থাকে (চিত্র ৬২)।

ফরোয়ার্ড। ফরোয়ার্ডদের প্রধান কর্তব্য বিপক্ষের গোলে আক্রমণ চালানো। দু'জন ইনসাইড-ফরোয়ার্ড খানিকটা পেছনের দিকে থাকেন,

আর সেণ্টার ও আউটসাইড-ফরোয়ার্ডরাই এগিয়ে গিয়ে সাধারণত চালটা শেষ করে দিয়ে আসেন, অন্য খেলোয়াড়রা পারতপক্ষে আসেন না।

অবশ্য, ইনসাইড-ফরোয়ার্ডদেরও উচিত আক্রমণের প্রথম সারিতে এগিয়ে গিয়ে গোলে শুট্ করার চেষ্টা করা।

ইনসাইড-ফরোয়ার্ডরাই আক্রমণের প্রধান নায়ক। তাঁরা হাফব্যাকদের সঙ্গে কাছাকাছি থেকে খেলেন। মাঝে-মাঝেই নিজেদের মাঠে পেছিয়ে এসে বিপক্ষদলের আক্রমণকারী হাফব্যাকদের পেছু তাড়া করেন।



চিত্র ৬২ ॥ হাফ-ব্যাক আক্রমণভাগের প্রথম সারিতে যোগ দিচ্ছেন।

সেণ্টার-ফরোয়ার্ড সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইদানীংকালে খেলার প্রকৃতি ও নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সেণ্টার-ফরোয়ার্ডদের নানা রকম দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

বহু সেণ্টার-ফরোয়ার্ড মাঠের মাঝখানেই বেশির ভাগ সময়টা খেলেন। সেখান থেকেই তাঁরা আক্রমণ সংগঠিত করে থাকেন। কেউ কেউ মাঠের মাঝখানে বলটিকে পেয়ে তবে আক্রমণের প্রথম সারিতে এগিয়ে যান। অন্য অনেকে আবার বিপক্ষদলের মধ্য-ব্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে হরদম নাকাল করতে থাকেন আর কেবলই সুযোগ খোঁজেন আক্রমণের ফাঁক পাবার। আরো অনেকে আছেন যাঁরা মাঝে-মাঝে প্রান্তভাগের দিকে সরে আসেন যাতে মধ্য-ব্যাককে প্রান্তের দিকে টেনে আনা যায়, এবং এইভাবে সেণ্টার মাঠ বরাবর তাঁদের নিজেদের দলের সঙ্গীদের পথ পরিষ্কার করে দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা প্রান্তভাগের তরফ থেকে নিজেরাই বড়োরকমের আক্রমণ চালাতে পারেন।

"তিন-ব্যাক" প্রথার খেলায় খেলোয়াড়দের এইগুলোই হল প্রধান কাজ।

অন্য নানারকম প্রথাও আছে, যেমন: "এক সারিতে পাঁচজনের" খেলা—এ প্রথা সোভিয়েট দেশে বহুদিন হল পরিত্যক্ত হয়েছে। খেলোয়াড়দের সাজানোর ধরনটা এই রকম:

গোলরক্ষক
(১ নং)

ব্যাক (২ নং) ব্যাক (৩ নং)

ডান হাফ-ব্যাক (৪ নং) সেণ্টার হাফ-ব্যাক (৫ নং) বাম হাফ-ব্যাক (৬ নং)

রাইট-আউট (৭নং) রাইট-ইন (৮নং) সেণ্টার-ফরোয়ার্ড (৯নং) লেফ্‌ট্‌-ইন (১০নং) লেফ্‌ট্‌ আউট (১১নং)

এ প্রথায় পাঁচজন ফরোয়ার্ডকেই এক সময়ে একযোগে আক্রমণ চালাতে হয়। হাফ-ব্যাকরা আক্রমণ ও রক্ষণ—দুটো তরফেই একসঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা ফরোয়ার্ডদের সহায়তা করেন এবং এতে সেণ্টার-হাফই তৎপর হন বেশি। ফুল-ব্যাক থাকেন দু'জন।

"তিন-ব্যাক" প্রথায় খেলোয়াড়দের বিন্যাস হতে পারে বহু প্রকারের, যেমন ধরুন—সামনে গিয়ে অথবা মাঠের মধ্যস্থলে দু'জন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড অনবরত বিপক্ষ গোলকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছেন, নিজেদের মাঠের দিকে একবারও ফিরে আসছেন না। এ-ক্ষেত্রে একজন ইনসাইড ও একজন আউটসাইড ফরোয়ার্ড পেছিয়ে এসে রক্ষণভাগকে সাহায্য করে থাকেন।

খেলোয়াড়দের সাজাবার ধরন এতে মোটামুটি এইরকম :

১ নং

২ নং ৩ নং ৪ নং

৫ নং ৬ নং

৭ নং ১০ নং

৮ নং ৯ নং ১১ নং

দু'জন সেণ্টার-ব্যাককে নিয়ে আরেকটা বিন্যাস হতে পারে : ১×৩×২×৪ এই ভাবে। এ ক্ষেত্রে তিনজন ব্যাকের পেছনে একজন সেণ্টার ব্যাক একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থেকে খেলেন সঙ্গে দু'জন হাফ ব্যাক ও চারজন ফরোয়ার্ড থাকে।

এ ছাড়া আরেকটা বিন্যাসও হতে পারে : ৩×৩×৪, অর্থাৎ এতে তিন-জন ব্যাক, তিনজন হাফ-ব্যাক ও চারজন ফরোয়ার্ড থাকেন।

এভাবে সাজানো হয় রক্ষণভাগকে জোরদার করার প্রয়োজন হলে।

বিপক্ষকে গোল দিতে বাধা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এতে চেষ্টা করা হয় যাতে অন্তত একটা গোল বিপক্ষকে দেওয়া যায়।

এ ছাড়া, ৪ × ২ × ৪—এ ধরনেরও একটা বিন্যাস হতে পারে, অর্থাৎ এতে চারজন ফুল-ব্যাক থাকবেন, পেনাল্টি-গণ্ডির ধার দিয়ে মোটামুটি একটা অর্ধবৃত্তের আকারে তাঁরা দাঁড়াবেন। দু'জন হাফ-ব্যাক থাকবেন যাঁরা ব্যাক ও ফরোয়ার্ডদের মধ্যে যোগাযোগ রাখবেন। চারজন ব্যাকেরই নিজস্ব একেকটা গণ্ডি থাকবে। আগের বিন্যাসের মতো এ বিন্যাসেরও উদ্দেশ্য রক্ষণভাগকে জোরদার করা।

একজন "টহলদার" ফরোয়ার্ডকে নিয়েও আরেক ধরনের বিন্যাস হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেই ফরোয়ার্ডটি সারা মাঠে অনবরত টহল দিয়ে বেড়ান আর চেষ্টা করেন মাঠের বিভিন্ন অংশে টিমের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখতে কিংবা বিপক্ষের রক্ষণভাগকে বিপর্যস্ত করতে। তিনি শুধু বিপক্ষের মাঠের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন না, দরকার মতো নিজের মাঠের দিকেও ফিরে আসেন। "টহলদার" ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলতে পারেন শুধু সেই রকম খেলোয়াড়ই যাঁর সারা মাঠ কভার করার মতো বিপুল দৈহিক ক্ষমতা আছে। এ ছাড়াও নানা রকমের ব্যক্তিগত কলাকৌশল খাটানো যেতে পারে যেমন ধরুন—একজন খেলোয়াড়কে লাগিয়ে দেওয়া হল বিপক্ষের সবচেয়ে ধুরন্ধর খেলোয়াড়টিকে পাহারা দেবার জন্য, যাতে তার ক্ষমতা ও তৎপরতাকে বহুল পরিমাণে ব্যাহত করা যায়।

ফুটবল খেলা শেখা ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি

ফুটবল খেলা শেখা নির্ভর করে শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন, ছাত্রদের সক্রিয় ও সচেতনভাবে শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও শিক্ষনীয় বিষয় সহজে বুঝে নেবার উপর। শিক্ষার এই মূল নীতিগুলি একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষাকৌশল হাতে-কলমে দেখালে ছাত্রদের মধ্যে খেলা শেখার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। কোনো কৌশল নির্ভুলভাবে বোঝা ও তাতে পারদর্শী হয়ে ওঠা সম্ভব হয় যদি সেই শিক্ষাকৌশল ব্যাখ্যা কর ছাড়াও তা দেখাবার ব্যবস্থা রাখা হয়।

ফুটবল খেলার কলাকৌশল প্রদর্শনের ব্যাপারে শিক্ষাদাতা নানা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন : তিনি নিজে মাঠে নেমে সেই পদ্ধতিগুলি দেখাতে পারেন অথবা কোন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে দিয়ে তা প্রদর্শন করাতে পারেন ; তিনি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় দলগুলির খেলা দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন অথবা ফটো, চিত্র, নকৃশা ছায়াচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রদর্শন করাতে পারেন।

শিক্ষাদাতা চাইবেন ছাত্রেরা যাতে তাঁর শেখানোর দিকে মনোযোগী ও আগ্রহশীল হয়। নিজে নিজে খেলা শেখার চেষ্টা করা, খেলায় নানা কলা-কৌশল অভ্যাস করা বা শিক্ষাদাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ—কখনো ভোরে ব্যায়াম করা, রেফারীর কাজ ও শিক্ষাদাতার কাজ অভ্যাস করা—তাদের ভুলভ্রান্তি ও দোষ ত্রুটি বিশ্লেষণ ইত্যাদির জিনিসগুলি খেলার ব্যাপারে খেলোয়াড়দের নিজের তরফ থেকে আগ্রহ বাড়িয়ে তোলবার পক্ষে চমৎকার পদ্ধতি।

খেলোয়াড়কে খেলাধূলার মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। খেলার পরিস্থিতি বদলালে তাঁকে সেই অনুযায়ী দরকারী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খেলা চলার সময় কখনো শিক্ষাদাতা তাঁকে সাহায্য করতে পারেন না। সুতরাং তাঁকে অবশ্যই নিজে নিজে চলতে সক্ষম হতে হবে।

হাতে কলমে শেখার সময় বোঝা যায় যে ওপর-ওপর খেলা শেখার ফল খুবই সামান্য পাওয়া যায় কারণ এরকম খেলা তিনি শেখেন নিষ্প্রাণভাবে। খেলোয়াড় খেলার নিয়ম-কানুন না ভেঙে ও খেলার সাধারণ পরিকল্পনা কৌশলকে বিঘ্নিত না করে যদি নিজের প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত পথ বেছে নিতে না পারেন তা হলে তিনি কখনোই ভাল খেলোয়াড় হতে পারেন না।

খেলার দক্ষতা বাড়াতে গিয়ে আগে যা শিখেছেন তার প্রতি খেলোয়াড় অবহেলা দেখাবেন না। ফুটবল খেলা সম্পর্কে যা কিছু শেখবার আছে স্বল্পসময়ের মধ্যে অবশ্য তা সবটা শেখা সম্ভব নয়। যেমন বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাকালের মধ্যে 'কিক্' করবার ও বল থামাবার সবগুলো কায়দা-করণ শেখা সম্ভব নয়।

খেলোয়াড়ের শরীরচর্চা বিষয়ক শিক্ষা, কলাকৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কিত শিক্ষা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। এই শিক্ষনীয় বিষয়গুলি একটি কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। খেলায় অভ্যাসের সময় নানা রকমের বিচ্যুতি, খুব বেশি প্রতিযোগিতা করে খেলা ইত্যাদি শিক্ষার সময়কার সমস্ত অতর্কিত বিঘ্নগুলি ট্রেনিংয়ের ধারাকে জটিল করে তোলে।

খেলোয়াড় যদি নিয়মিতভাবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিক্ষালাভ না করেন তা হলে তাঁর পক্ষে নৈপুণ্য অর্জন ও কলাকৌশলে পারদর্শী হয়ে ওঠা এবং শারীরিক দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। দক্ষতা অর্জন জিনিসটা শারীরিক ব্যায়ামের নিয়মের অধীন ; এলোমেলো শিক্ষালাভ করলে বাঞ্ছিত ফল লাভ সম্ভব হয় না।

নিয়মিত শিক্ষার ফলে আরো একটি কাজ হয়: এর মধ্য থেকে খেলোয়াড়ের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা এসে পড়ে।

শিক্ষনীয় ব্যাপারের বিষয়বস্তু ও পরিমাণ স্থির করা চাই খেলোয়াড়দের বয়স, শারীরিক গঠন ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক দিকগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে। তা নইলে তারা শিখতে পারবেন না। অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষনীয় বিষয় ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দেওয়া চলতে পারে।

শিক্ষার অতিরিক্ত চাপের ফলে শিক্ষায় খেলোয়াড়দের আগ্রহ কমে যেতে পারে ও তাঁদের মনে নিরুৎসাহ ভাবের সৃষ্টি হতে পারে। একটু একটু করে যুক্তিযুক্তভাবে শারীরিক ব্যায়াম বাড়ালে অবিচলিতভাবেই উন্নতি করা যায়।

বিভিন্ন রকমের অসুবিধা কি করে কাটিয়ে উঠতে হবে তা খেলোয়াড়কে অবশ্যই শিখতে হবে ও খেলার যে সব চর্চাগুলিতে ইচ্ছাশক্তির দরকার সেগুলো অভ্যাস করতে হবে. সেগুলো সাধারণ চর্চা থেকেও কঠিনতর হয়ে উঠতে পারে। ঠিকমতভাবে খেলা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

খেলোয়াড়দের খেলাশিক্ষার মূল নিয়মগুলি অনুসরণ করে সরল থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন ব্যাপারগুলি শিক্ষাদানের মধ্য থেকে শিক্ষক তাদের যোগ্যতা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানকে তাড়াতাড়ি উন্নত করে তুলতে পারবেন।

ফুটবল খেলার কলাকৌশল ও কায়দাকরণগত দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষাদানের সময়ে শিক্ষক আগে শিক্ষনীয় বিষয়টির উদ্দেশ্য (যেমন, সঠিকভাবে বল কিক্ করার কায়দা) ব্যাখ্যা করবেন ও পরে তা প্রদর্শন করবেন। সব শেষে খেলোয়াড়রা নিজেরাই তা অভ্যাস করতে চেষ্টা করবেন ।

খেলোয়াড়রা দক্ষ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এই শিক্ষাক্রমই চালু থাকবে।

খেলোয়াড়রা যখন এই শিক্ষাক্রম অভ্যাস করতে চেষ্টা করবে তখন শিক্ষক তাদের প্রতি নজর রাখবেন ও তাদের ভুলত্রুটি শুধরে দেবেন।

ফুটবলখেলার নানা নির্দিষ্ট দিকে দক্ষ হয়ে উঠতে গেলে একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে কি কি চাই ? যেমন ধরা যাক ছুটন্ত অবস্থায় পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করা : তাকে এইসব ব্যাপারে সমর্থ হতে হবে।

১। যথেষ্ট জোরে দৌড়নো এবং দরকারমতো জোর দিয়ে বল মারা।

২। যাতে ভালো করে কিক্ করা যায় সেজন্য এক পায়ে ভারসাম্য রাখা।

৩। নির্ভুলভাবে পা দুলিয়ে নিয়ে ও পায়ের পাতার পিঠকে যথাযথ-ভাবে বলের সংস্পর্শে এনে বল মারা ।

এ ব্যাপারটিতে সক্ষম হয়ে উঠতে গেলে ওপরের তিনটি আলাদা কাজকে একসঙ্গে মেলাতে হবে, আজেবাজে দেহভঙ্গি বন্ধ করতে হবে ও নিরর্থক দেহের পেশীকে বেশি খাটানো বাদ দিতে হবে। একনাগাড়ে অভ্যাস করার মধ্য থেকেই এ ব্যাপারটি শেখা সম্ভব।

খেলার সময়ে ফুটবলের এই আংশিক দিকগুলি আলাদা আলাদাভাবে অথবা গোটা ব্যাপারটি একসঙ্গে বা কয়েকটি দিক মিলিয়ে নিয়ে অভ্যাস করা চলতে পারে। কিন্তু খেলা অভ্যাস করার সময়ে উপরের গোটা ব্যাপারটিই একনাগাড়ে করতে হবে, কিছুতেই আলাদা আলাদাভাবে করা চলবে না।

শিক্ষক যখন এই ছুটন্ত অবস্থায় পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করা শেখাবেন, তিনি কখনোই প্রথমে দৌড়নো, তারপর দাঁড়াবার পা-টি মাটিতে ঠিক জায়গায় রাখা, তারপর পায়ের পাতার পিঠের মাঝখানের জায়গাটা বলের সংস্পর্শে আনা, এভাবে আলাদা করে শেখাবেন না, তিনি গোটা কিক্‌টিই একসঙ্গে করে দেখাবেন এবং তাঁর খেলোয়াড়দের তা করতে বলবেন। তারপর তাদের যে-সব ভুলত্রুটি হবে সেগুলি দেখাবেন ও বার বার তাদের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তা শুধরে নিতে শেখাবেন।

এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে খেলার চালের সাধারণ কাঠামোটি বজায় থাকে। এবং এর সাহায্যে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত বিশেষত্বও ঠিকভাবে সদ্ব্যবহার হয়। খেলার কলাকৌশল ও কায়দাকরণগুলি শেখার মূল পদ্ধতি এইটেই।

খেলার কোনো একটি গোটা চাল ভাগ-ভাগ করে শেখার পদ্ধতি সেই বিশেষ চালের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গে খেলোয়াড়কে অভ্যস্ত করে তোলে এবং পরে সবটাই একসঙ্গে অভ্যাস করা যায়। কিন্তু শিক্ষার সময়ে ভাগ-ভাগ করে শিখলে, গোটা চালটি একসঙ্গে ঘটবার সময়কার বিশেষ পরিস্থিতিগুলি হাজির করা সম্ভব হয় না। সে সময়ে খেলার চালের প্রতিটি অংশের চরিত্রই পাল্টে যায়। তাই, এই পদ্ধতিতে ছুটন্ত অবস্থায় পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করা ব্যাপারটাকে কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবার সময়ের মতো করে পা দুলিয়ে নিষ্পন্ন করতে পারে না।

যদি এ জিনিসটি অবহেলা করে কেউ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিক্ করা অভ্যাস করেন, তবে এ ব্যাপারটি ভুলভাবে শেখা হবে ও বারবার করে শিখতে গিয়ে তাতে প্রভূত সময় বাজে নষ্টই হবে। সুতরাং এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা উচিত খুবই কম, শুধু খুব জটিল চালগুলি বোঝবার জন্য ও খেলোয়াড়দের ভুলভ্রান্তিগুলি শুধরে দেবার জন্যে। উদাহরণত বলা যায় যদি কোনো খেলোয়াড় ছুটন্ত অবস্থায় কিক্ করতে গিয়ে বল থেকে অনেক দূরে তাঁর দাঁড়াবার পা-খানি রাখেন এবং ঠিকভাবে কিক্ করতে অসমর্থ হন তা হলে তিনি আলাদা আলাদা করে কিক্ করবার কৌশলটি শিখতে চেষ্টা করতে

পারেন। তারপর ব্যাপারটি তাঁর আয়ত্ত হবার পর তিনি একই সঙ্গে গোটা কিক্‌টি অভ্যাস করা শুরু করবেন।

খেলোয়াড়েরা নিজে থেকে খেলার কোনো চাল অভ্যাস করার আগে সে ব্যাপারটির ঠিক কৌশলটি শিখে নেবেন। কিন্তু তার পরেও তা অভ্যাস করার সময়ের মধ্যে শিক্ষাদাতা তাঁর নিয়মিত তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়ে দরকার-মতো তাদের ত্রুটি শুধরে দেবেন ও ভুলভ্রান্তি দূর করে দিতে চেষ্টা করবেন। খেলোয়াড়ের খেলা অভ্যাস করার চালের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক মনো-যোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে অবিলম্বেই তার ভুলভ্রান্তি দূর করে দেওয়া চাই।

ফুটবলের যে কোনো চাল কাজে খাটানোর প্রথম কথাই হল একেবারে শুরুতে খেলোয়াড়ের অবস্থান কী আছে তা বোঝা। গড়িয়ে আসা বা শূন্যের কোনো বলে খুব জোরে নির্ভুলভাবে কিক্ করতে গেলে বল অনুপাতে খেলোয়াড়ের নিজের অবস্থান ঠিক কি হবে তা বুঝে নেওয়া চাই। ফুটবল খেলা শেখার সময় বল মারবার আগের সঠিক মুহূর্তটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

প্রতিপক্ষকে ঠকাবার চালের মতো খেলার নানা জটিল কায়দাগুলিকে আয়ত্ত করতে গেলে খেলোয়াড়ের গতিশীলতা, দ্রুততা ও ভারসাম্য বাড়ানোর বিশেষ ব্যায়ামগুলি খুবই সহায়ক হয়। এ-ধরনের ছলা-কৌশলের চাল শিখতে গেলে আসল মতলব লুকোবার জন্য খেলোয়াড়কে তাড়াতাড়ি গা ছেড়ে দেওয়া, পায়ের চালের চাতুরি ইত্যাদি বেশ পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত করতে সমর্থ হতে হবে। এই সব শিখতে হলে খেলোয়াড়কে বল বাদ দিয়েই কয়েকটি খেলা (যেমন যে সব খেলায় হঠাৎ এক পাশে সরে যেতে পারা, দ্রুততা অথবা "ট্যাগ" বা গোঁত্তা মেরে শরীর নুইয়ে দিতে পারার প্রয়োজন হয়) খেলে নিতে হবে।

এই বিশেষ শিক্ষনীয় জিনিসগুলো সময় বাঁচায় এবং দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এইভাবে বলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ছোটা আয়ত্ত করতে গিয়ে খেলোয়াড়েরা যদি (দৌড়ানো, তাড়াতাড়ি পাহারা এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি) বিশেষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে না শেখেন তবে তাঁদের ছোটবার গতি হবে খুবই ধীর, তাঁদের দৌড়ানোর এবং খেলার চালের সাবলীলতা থাকবে না।

উপরোক্ত খেলার শিক্ষাবস্তুগুলিতে দক্ষতা অর্জন করা, সেগুলি আয়ত্ত করে রাখা ও সেগুলি উন্নত করে তুলতে গেলে খেলায় নানা রকম অবস্থার মধ্যে

(যেমন প্রতিযোগিতার সময়ে, প্রতিপক্ষের বিরোধিতার মধ্যে, সমস্ত রকমের আবহাওয়ার মধ্যে ইত্যাদি) আরও কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের চালের সঙ্গে একত্রে অবিরতভাবে অভ্যাস করে যাওয়া দরকার। এমনিভাবে বলা যায় যে, শুধু কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে ও শুধু এক পা দিয়ে গোলে বল মারা অভ্যাস করা উচিত নয়। খেলোয়াড়কে দুই পা দিয়ে, নানা দূরত্ব থেকে নানা পরিস্থিতিতে (যেমন, যখন বাধা থাকে এবং যখন থাকে না, বল শূন্যে থাকার সময়ে, কিংবা হাফ-ভলি কিকে, ছুটন্ত অবস্থায় ইত্যাদি) অবশ্যই বল মারা শিখতে হবে। বিশেষ বিশেষ সরঞ্জাম নিয়ে, নানা গতিতে, নানা অবস্থার মধ্যে (যেমন শীতকালে, আউটডোর খেলায়, ব্যায়ামাগারের শিক্ষায়) তাঁকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। এসব তাঁকে শিখতে হবে আরো কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষনীয় জিনিসের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে, যেমন— বল পাকড়ানোর সঙ্গে বল মারা, বল নিয়ে ছোটবার সঙ্গে বল মারা, বল নিয়ে ছোটবার সঙ্গে বিপক্ষকে ঠকাবার ফন্দিফিকির, আবার বল মারা ইত্যাদি।

কেবলমাত্র খেলার চাল ভালো করে আয়ত্ত করে নেবার পরই খেলোয়াড়রা ক্রমে ক্রমে আরো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শিখতে শুরু করবেন। একঘেয়ে ভাবকে এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ একঘেয়ে শিক্ষা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, একই জিনিসের যথেষ্ট বেশি পৌনঃপুনিকতাও পরিহার করা উচিত।

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আলাদাভাবে অনুশীলনীর অভ্যাস বিশেষ কাজে লাগে। এ সব খেলার জন্য বিশেষ সময়ও বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় স্থির করা উচিত, যাতে খেলার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়রা নতুন নতুন ও তাঁদের যে সব বিষয় ভালো লাগে তা অভ্যাস করতে পারেন ও তাঁদের বিশেষ বিশেষ দুর্বলতাগুলি দূর করতে পারেন।

যে খেলোয়াড়রা তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষ অনুশীলনী অভ্যাস করতে ভালোবাসেন, তাঁরা তা নিজেদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য বার বারই অভ্যাস করতে পারেন। উদাহরণত বলা যায়, যে খেলোয়াড়েরা একলা, দুজনে বা তিনজনে মিলে বল লোফালুফি করতে ভালোবাসেন, তাঁরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্লান্ত হয়ে পড়েন ততক্ষণ ধরেই তা চালাতে পারেন। এইসব ব্যক্তিগত শিক্ষাবস্তুর একটানা বার বার অনুশীলনের মধ্য থেকে খেলায় খেলোয়াড়রা দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করে এবং ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়ের যে উৎসাহ দরকার তা এতে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতা করে খেলবার মনোভাবটি শিক্ষাকালে খেলোয়াড়দের খেলাকে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যে গোলে বল মারা অভ্যাস করবার সময়ে জোরে জোরে গোল সংখ্যা গুণলে বল মারার নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।

ফুটবল খেলোয়াড়েরা সুযোগ পেলেই প্রতিযোগিতামূলক খেলা (টিম গেম, রিলে-রেস ইত্যাদিতে) যোগদান করবেন। খেলোয়াড়দের শিক্ষার ব্যাপারে এই প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে। ফুলবল ট্রেনিংয়ের মাঠের জন্য অনেকগুলি বল থাকলে ভালো হয়। সম্ভব হলে বল রাখা উচিত খেলোয়াড়-পিছু একটা করে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ বল না থাকে তবে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে প্রত্যেক খেলোয়াড়ই পালা করে বল পেতে পারেন। শিক্ষকের নজর রাখা উচিত যাতে অনুশীলনীগুলো নির্ভুলভাবে পালন করা হয়। খেলোয়াড়দের দক্ষতা অবিশ্যি আরো তাড়াতাড়ি বাড়বে আসল খেলার মধ্য থেকেই। কাজেই দুই দলের মধ্যেকার খেলায় খেলোয়াড়দের নিয়মিত সুযোগ দেওয়া উচিত।

শিক্ষার উপর এই কাজ বিশেষ তাৎপর্য বিস্তার করে। ব্যাখ্যা ও প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই অনুশীলনীর পরিষ্কার ছবিটি ফুটে ওঠে। শিক্ষাদাতা খেলোয়াড়দের অবস্থানগুলি এমনভাবে ঠিক করে দেবেন যাতে শিক্ষার সময় তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার খুঁটিনাটি দরকারী বিষয়গুলির দিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

যেমন ছুটন্ত অবস্থায় কিক্ করার কথা বলা যাক। এই কিকের নমুনা দেখাবার সময় শিক্ষককে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে হবে দাঁড়ানো পা-খানি ঠিক কি ভাবে বলের কাছে রাখতে হবে এবং কিক্ করবার পা-খানি কি করে হাঁটু ও পায়ের পাতার গাঁটে মুড়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী জটিল হলে খুব ভালো রকমের প্রদর্শনও আসল জিনিসটি ধরিয়ে দিতে পারবে না। প্রদর্শনের আগে কিংবা প্রনর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাই শিক্ষাদাতাকে তার ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

ফুটবল খেলার 'চাতুরীপূর্ণ' চালগুলি প্রদর্শনের আগে শিক্ষককে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে যে, এই চালগুলির উদ্দেশ্য হল খেলোয়াড়দের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে

লুকিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় ফেলে দেওয়া। প্রতিপক্ষ যদি আসল মতলবটি আন্দাজ করে ফেলে তাহলে এই চাল নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারলেও প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না। যেমন ঠকাবার চালের মূল তাৎপর্যটি ধরতে না পারলে খেলোয়াড় হয়তো এতটা দূর থেকে এই চাল শুরু করবেন ও তাতে এমনভাবে ডুবে থাকবেন যে তাঁর 'ছলা-কৌশল' সব শেষ হয়ে যাবার পর তবে হয়তো প্রতিপক্ষ আক্রমণ করবেন, তার আগে আর তিনি আক্রমণই করবেন না। আবার হয়তো কখনো তিনি প্রতিপক্ষের এত কাছ থেকে এই ঠকাবার চাল নিতে যাবেন .য, গোটা চা.লের কাজটা শেষ হবার আগেই প্রতিপক্ষ বল কেড়ে নেবেন।

প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা একে অপরের পরিপুরক। কখন কোন্‌টি করতে হবে তা নির্ভর করে খেলায় চালের ওপর। যেমন ধরুন, ছোটবার সময়ে বল আয়ত্তে রাখার জন্য পায়ের পাতার ভেতরের দিকের ব্যবহারটি শেষ হয়ে গে.ছে, এখন এই ব্যাপারে পায়ের পাতার বাইরের দিকের ব্যবহার কি হবে শেখাতে গেলে শুধু প্রদর্শনই যথেষ্ট। অপর দিকে, যদি সুশিক্ষিত খেলোয়াড়দের তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কোনো নতুন কায়দা-কৌশল শেখাতে হয়, তবে শুধু ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট। খেলা শিক্ষায় ছায়াচিত্র বা ঐ জাতীয় জিনিস খুব কাজে লাগে।

শিক্ষাদাতা অনুশীলনীর গোড়াতেই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন। খেলোয়াড়েরা সাধারণত যে-সব ভুল করে থাকেন, শিক্ষক শেখাবার সময়ে সেগুলির ব্যাখ্যা করবেন ও সব থেকে দরকারী খুঁটিনাটি দিকগুলি তাঁদের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করবেন।

শিক্ষক তাঁর ব্যাখ্যাগুলি খেলোয়াড়েরা ধরতে পারছেন কিনা সে বিষয় সুনিশ্চিত হয়ে নেবেন। কখনো কখনো শেখানো থামিয়ে হয়ত শূন্যের বলে ভালো কিক্ করতে পারেন এমন কোন খেলোয়াড়কে ডাকলেন। তিনি অন্যান্যদের সুবিধার জন্য কিক্‌টি প্রদর্শন করালেন ও ব্যাখ্যা করে দিলেন।

শিক্ষাক্রমের মধ্যে শিক্ষকের আদেশদান ব্যাপারটির বিশেষ মূল্য আছে। একটি সুস্পষ্ট আদেশ খেলোয়াড়দের মনের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে ও কাজটি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পালন করেন। কিন্তু খুব ঘন-ঘন, উঁচু সুরে আদেশ দেওয়া ঠিক নয়, তাতে খেলোয়াড়ের মন মুষড়ে পড়ে।

খেলার আগে নির্দেশ দেওয়া ও খেলার পরের বিশ্লেষণের পদ্ধতি হওয়া উচিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। শিক্ষক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে উপস্থিত করার জন্য তাঁর বক্তৃতাটিকে সুশৃঙ্খলভাবে তৈরি করবেন।

শিক্ষার সময়ে নিছক নিচের কারণগুলির জন্য খেলোয়াড়েরা বড় কম ভুল করেন না;

(ক) অনুশীলনীগুলিকে না বুঝে শুধু যান্ত্রিকভাবেই তাঁরা তা শেখেন ও অবহেলার সঙ্গে পালন করেন ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষক পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন না, অনুশীলনীগুলো শেখান অবহেলার সঙ্গে, প্রতি খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে ডেকে দেখিয়ে দেন না, ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেন না ইত্যাদি।

(গ) প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সাজ-সরঞ্জামের বিশেষ অভাব থাকে ইত্যাদি।

ভুল অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তা শোধরানো কঠিন হবে, তাই খেলোয়াড়-দের প্রত্যেকটি অনুশীলনী ও তার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে।

যে-সব ছাত্রেরা নতুন শিক্ষা শুরু করেছেন তাঁরা যাতে অনুশীলনীগুলি নির্ভুলভাবে অভ্যাস করেন সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। গোড়াতেই খেলোয়াড়রা অনেক সময় ভুল অভ্যাস করে ফেলেন, পরে তা শোধরানো দুঃসাধ্য হয়।

সাজসরঞ্জাম ও ভালো সুযোগ-সুবিধা থাকলে ভুল ভ্রান্তির দায় এড়ানো যায়। শিক্ষক সময় পেলেই মাঠের অবস্থা ও সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করে রাখবেন। বলটিও ভালো হওয়া দরকার, তার আকৃতি ও ওজন যেন যথাযথ হয়। খেলোয়াড় যে জুতো ব্যবহার করছেন (ব্যায়ামের বা ফুটবলের বুট) তার ধাঁচের সঙ্গে বলের থাকা দরকার।

খেলোয়াড়দের ভুলভ্রান্তিগুলি ধরিয়ে দেবার জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। ভুলভ্রান্তিগুলি কি রকম ও তার কারণগুলি কী ভালো করে তা লক্ষ্য করে শুধরে দেবার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উরুসন্ধি ভালোরকম ঘোরাতে-ফেরাতে না পারলে প্রায়ই বল কিক্ করা খারাপ হয়। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষক এমন ধরনের ব্যায়ামের কাজ নেবেন যাতে ছাত্র দেহের এই অংশকে ঘোরানো-ফেরানোর ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

অনেক সময়ে পূর্বাহ্ণে অতিরিক্ত অনুশীলনের খাটুনির জন্য খেলোয়াড়দের ভুল-ভ্রান্তি ঘটে। তাই শিক্ষক এমনভাবে শিক্ষাক্রম সাজাবেন যাতে তারা ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

ভুল-ভ্রান্তি ঘটবার অনেক কারণ আছে, সংশোধন করবারও বহু উপায় রয়েছে। প্রধান কথা হল অবহেলা না করে খেলোয়াড়রা যাতে ভুলভাবে অনুশীলনী চর্চা না করেন সেদিকে নজর রাখা, ভুল চাল প্রদর্শিত না হয় তা দেখা, ভুলের কারণ তাঁরা নিজেরা যাতে খুঁজে বের করে শোধরাবার উপায় করতে পারেন, তাঁদের তা শেখানো।

খেলা শিক্ষা দেবার অনেক পদ্ধতি আছে, পদ্ধতি ঠিক করতে হবে খেলোয়াড়দের বয়স, ব্যক্তিগত ঝোঁক ও খেলায় দক্ষতার তারতম্য বিচার করে। শিক্ষনীয় বিষয়ের ধরন ও উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুসারে বল নিয়ে খেলা কিংবা তত্ত্বগত শিক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতির রকমফের ঘটবে। খেলার মূলগত পদ্ধতি ও কৌশল সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করার দিকে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। খেলোয়াড়দের শারীরিক ক্ষমতা ও নৈতিক গুণ বাড়িয়ে তোলার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষক প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে শেখাবার দিকেও সর্বদা নজর দেবেন। যদিচ ফুটবল খেলাটা হল দলগত ব্যাপার আর এতে দলগত শিক্ষাই হল আসল জিনিস, কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও কম না। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের বৈশিষ্ট্য ও তাঁদের ভালো দিক ও ভুলত্রুটির দিক বুঝে নিয়ে শিক্ষক পরিকল্পনা করবেন ও প্রত্যেক খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে শিক্ষা দেবেন।

আগেকার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য একটা করে বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে কোনো খেলোয়াড়ের শারীরিক ক্ষমতা (দ্রুততা, শক্তি, সহনশীলতা) বাড়াবার দরকারী দিক, মূলগত কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করার বিষয়, এবং খেলার অনুষ্ঠানে যাতে একটা বিশেষ ধাপ পর্যন্ত উঠতে পারা যায় সেই ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনা যাতে কার্যত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার জন্য শিক্ষক তাঁর শিক্ষদানের মধ্যেই বিশেষ করে সময় করে নেবেন।

শারীরিক পুষ্টির অভাবে অথবা আহত হবার জন্য যে সব খেলোয়াড়রা খেলা শিক্ষার ব্যাপারে পেছনে পড়ে আছেন তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের অনুশীলনী স্থির করে দিতে হবে।

অসুস্থতার জন্য হয়তো কোনো খেলোয়াড় তিন চারটি পাঠে যোগ দিতে পারেননি এবং এখনো শারীরিক দুর্বলতার জন্য দলের সঙ্গে একত্রে শিখতে সক্ষম নন; এমন খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে ব্যক্তিগত কিছু পাঠ্য বিষয় স্থির করে দিতে হবে ও তারপরেও দেখতে হবে দলের নিয়মিত শিক্ষায় যোগদানের পর তাঁর উপর চাপ না পড়ে। এ দিক থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ডাক্তারি তত্ত্বাবধানের সাহায্য নেওয়া বিশেষ মূল্যবান, কারণ এতে শিক্ষকের পক্ষে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের শারীরিক অবস্থা নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী তাঁর শিক্ষার জন্য সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ধারা

খেলা শিক্ষা ও চর্চার সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগে করা যেতে পারে: প্রস্তুতিকাল, ফুটবলের মরশুম ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কাল।

[সোভিয়েট দেশের অভ্যন্তরভাগে মে থেকে অক্টোবর অবধি ফুটবল প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু দক্ষিণের গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় বছরের প্রায় দশ মাসই প্রতিযোগিতা চলে—সুতরাং খেলার তুলনায় প্রস্তুতিকাল সেখানে কম]।

কোচিং ও ট্রেনিং-এর কাজটা গ্রুপ হিসাবে, টিম হিসাবে, এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও চলতে পারে—সেটা নির্ভর করছে ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপর। তাই প্রতিযোগিতা মরশুমের অনেক আগে, শীতকালেই খেলোয়াড়দের শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে তাঁদের অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু প্রতিযোগিতার মরশুম কাছাকাছি এসে পড়লে খেলোয়াড়দের টিম বা দল হিসাবে গড়ে নিতে হবে, যাতে সেই টিমই মরশুমের সময় খেলবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। প্রতিযোগিতার মরশুমে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কোচ্ করতে হবে। যাঁরা পেছিয়ে আছেন অথবা খেলার যেসব খুঁটিনাটি শিখতে বাকি আছে তা এই সময় সেরে ফেলতেই হবে।

ফুটবল চর্চার (প্র্যাকটিসের) ভিত্তি হবে নিম্নলিখিত শিক্ষাক্রমের ধারায়: (১) শরীর চর্চা, (২) বল প্র্যাকটিস, (৩) সমন্বয় শিক্ষা, (৪) ব্যক্তিগত শিক্ষা, (৫) তত্ত্বগত শিক্ষা, (৬) প্র্যাকটিস খেলা, (৭) তদারকী ব্যবস্থা ও (৮) বিশেষ ব্যায়াম।

(১) **শরীরচর্চার** শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হল সাধারণভাবে খেলোয়াড়দের দৈহিক উন্নতি, তাঁদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বাড়িয়ে তোলা (যেমন সহ্যক্ষমতা, গতিবেগ, শক্তি ও তৎপরতা) এবং প্রতিযোগিতার জন্য তাঁদের তৈরি করা।

শরীরচর্চা সংক্রান্ত শিক্ষা ফুটবল কোচ্‌ই দিয়ে থাকেন। নীচে একটা সাধারণ খসড়া দেওয়া হল :

১। হাঁটা এবং দৌড়ানো (ধীরে ধীরে)।

২। শরীরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম।

৩। স্বল্প দূরত্বের দৌড়।

৪। লাফানো, বল ছোঁড়া, অন্যান্য খেলাধূলা ও জিম্‌নাষ্টিকস্।

৫। একবার দৌড় দিয়ে ব্যায়াম শেষ করা ও শ্রান্তি দূর করার জন্য হাঁটা।

এর বিকল্প ব্যবস্থাও হতে পারে :

১। হাঁটা এবং দৌড়ানো (ধীরে ধীরে)।

২। সাধারণ ব্যায়াম।

৩। পর পর বিভিন্ন দূরত্বের দৌড় অথবা দীর্ঘ দৌড়। অথবা ২০০০ গজ অবধি দৌড়ানো।

৪। শেষবারের মতো একবার দৌড়ানো অথবা হাঁটা।

উপরোক্ত শিক্ষা হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে। কোচিং-এর প্রত্যেকটি স্তরেই শরীরচর্চার প্রয়োজন হবে।

(২) **বল প্র্যাকটিসের** উদ্দেশ্য খেলোয়াড়কে পদ্ধতি ও কৌশলগুলো শেখানো। এর সঙ্গে সঙ্গে চলবে শারীরিক কসরত। প্র্যাকটিস তদারক করবেন কোচ্ স্বয়ং।

বল প্র্যাকটিসের একটি খসড়া পদ্ধতি দেওয়া হল :

১। বল নিয়ে অথবা বল ছাড়াই দৌড়ানো ও হাঁটা।

২। বল নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চর্চা।

৩। বল আটকানো, পায়ের কাজ, কিক্ করা ও পাস্ অভ্যাস করা।

৪। বলসহ খেলা অথবা খেলার মাধ্যমে ব্যায়াম (দু'জনের বিরুদ্ধে তিনজন খেলোয়াড়, একেক দিকে পাঁচজন করে ইত্যাদি)।

৫। শেষবারের মতো দৌড় ও হেঁটে ক্লান্তি দূর করা।

প্র্যাকটিসের মেয়াদ দেড় ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা। প্রস্তুতিকালে ও প্রধানত কোচিং ও ট্রেনিং-এর সময় বল প্র্যাকটিস করতে হয়।

বল প্র্যাকটিস হলঘরের ভেতরেও হতে পারে, বাইরেও হতে পারে।

সাধারণত দু'জন, তিনজন কি আলাদাভাবে একেকজন খেলোয়াড় বল প্র্যাকটিস করে থাকেন। খেলা ও ব্যায়ামচর্চা অবশ্য গ্রুপ বা টিমের মধ্যে (চার থেকে এগারজনকে একেক দলে নিয়ে) হতে পারে।

প্র্যাকটিসের উদ্দেশ্য ও অবস্থা বুঝে এর চেয়ে বড়ো বড়ো গ্রুপও হতে পারে (প্র্যাকটিস খেলায় ২২ জন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন)।

(৩) **সমন্বয় শিক্ষার** লক্ষ্য হল একই সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা, ফুটবলের পদ্ধতি ও কায়দাকরণ সম্পর্কে কোচিং দেওয়া। কোচ্ই তদারক করবেন।

সমন্বয় শিক্ষার ধারা মোটামুটি এই ধরনের :

১। হাঁটা ও দৌড়ানো (ধীরে ধীরে)।

২। সাধারণ ব্যায়াম।

৩। জিম্‌নাষ্টিকস, দৌড় ও ক্রীড়া।

৪। বল থামানো, বলের সঙ্গে দৌড়ানো, কিক্ করা, পাস্ করা।

৫। খেলা, খেলা-সহযোগে ব্যায়াম, রীলে রেস্।

৬। শেষবারের মতো দৌড় ও হেঁটে বিশ্রাম করা। এতে প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টার দরকার হবে। কোচিং ও ট্রেনিং-এর একটি প্রধান অঙ্গ সমন্বয় শিক্ষা (বিশেষ করে যখন অনুশীলনীর জন্য শিক্ষার সময় পাওয়া যায় কম)

(৪) **ব্যক্তিগত শিক্ষা** তাঁদেরই দেওয়া যায় যাঁরা গ্রুপের তুলনায় পেছিয়ে পড়েছেন, যাঁরা নিজেদের ভুল শোধরাতে চান অথবা নিজেদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য যাঁরা বিশেষভাবে চর্চা করতে চান। ব্যক্তিগত-ভাবে পরিকল্পনা করে কোচ্ অথবা অভিজ্ঞ কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগত শিক্ষার ধারা এই ধরনের হতে পারে ;

১। দৌড়ানো ও হাঁটা।

২। সাধারণ ব্যায়াম।

৩। ফুটবলের কায়দাকরণ শেখা (কোচের ব্যবস্থা অনুযায়ী)

৪। শেষবারের মতো দৌড়ানো ও হাঁটা।

শিক্ষাকাল তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট।

(৫) **তত্ত্বগত শিক্ষার** আওতায় পড়ে খেলার তাত্ত্বিক বিষয়। বক্তৃতা, আলোচনা, রিপোর্ট, নির্দেশ ও বিশ্লেষণের আকারে তত্ত্বগত শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৬) **প্র্যাকটিস খেলার** লক্ষ্য হল টিম-ওয়ার্ক উন্নত করা, কায়দা ও কৌশল আয়ত্ত করা ও বিভিন্ন ধরনের চাল শেখা। এ ছাড়া প্র্যাকটিস খেলায় দেহচর্চারও সুযোগ মেলে।

পুরো টিম নিয়ে, নিয়মাবলী অনুযায়ী প্র্যাকটিস খেলা হয়; খেলার আগে শিক্ষাদাতা নির্দেশাদি দেন ও খেলার বিশ্লেষণ করেন।

(৭) **তদারকী ব্যবস্থা** দ্বারা খেলোয়াড়রা কায়দাকরণ আয়ত্ত করা ও শারীরিক উন্নতির দিক থেকে কতোটা এগোলেন তা যাচাই করা যায়।

টিম অথবা গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তদারকী করা যেতে পারে—এতে খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ উন্নতিরই সহায়তা করা হবে।

(৮) **বিশেষ ব্যায়ামের** লক্ষ্য শুধু খেলোয়াড়দের সাধারণ শারীরিক সক্ষমতাই বাড়ানো নয়, দৈহিক চর্চা ও ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য খেলোয়াড়দের গড়ে তোলার একটা উপায়ও এই বিশেষ প্রস্তুতিমূলক ব্যায়াম।

টিম যখন বিদেশে বা অন্যত্র গিয়ে খেলছে তখন শিক্ষাদাতার ব্যবস্থা অনুযায়ী অথবা তাঁর তদারকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে ব্যায়াম চর্চা করতে পারেন।

বাইরে গিয়ে প্রস্তুতিমূলক ব্যায়াম চর্চার মোটামুটি একটা ধারা এই ধরনের হতে পারে:

১। আগে থেকে স্থির করে রাখা কোন পার্কে বা নদীর ধারে হেঁটে চলে যাওয়া।

২। হাঁটা এবং দৌড়ানো (ধীর গতিতে)।

৩। সাধারণ উৎকর্ষের জন্য ব্যায়াম চর্চা (দশ থেকে বারো রকমের ব্যায়াম)।

৪। নিজস্ব ঘাঁটিতে ফিরে আসা।

এইসব ব্যায়ামে কুড়ি থেকে ত্রিশ মিনিট অবধি সময় লাগে, তারপর ফিরে এসে স্নান করতে হয়। ধারা স্নান আরো ভালো। আর সেই সঙ্গে

শরীর দলাই মলাই। ট্রেনিংয়ের প্রত্যেকটা পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক ব্যায়াম চলতে পারে।

ট্রেনিং কর্মসূচীর বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের অদলবদল চলতে পারে।

সাধারণ ট্রেনিং কর্মসূচী অনুসারে শিক্ষাক্রম সাজানো হয়ে থাকে এবং তার চারটি পর্যায় আছে : (ক) প্রারম্ভিক, (খ) প্রস্তুতি, (গ) প্রধান ও (ঘ) সমাপ্তি। অনেক সময় তিনটি পর্যায়ও করা হয় প্রারম্ভিক ও প্রস্তুতির পর্যায় একই সঙ্গে মিলিয়ে।

(ক) প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা হয় ; পরবর্তী শিক্ষাকালে যাতে অধিকতর পরিশ্রম করা যায় তাঁর জন্য এই পর্যায়ে শরীর গঠনের প্রস্তুতি চলে। ব্যায়ামের মধ্যে ধীরগতিতে দৌড়, হাঁটা ও তৎপর থাকার ব্যায়ামগুলি থাকে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে শিক্ষাক্রমের প্রধান অংশের জন্য খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করার বিশেষ অনুশীলনী। প্রধান শিক্ষা পর্যায়ের প্রকৃতির ওপর প্রস্তুতি পর্যায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাই, প্রধান পর্যায়ের উদ্দেশ্য যদি থাকে মূল কায়দা-করণ ও পদ্ধতি প্র্যাকটিস করার তাহলে এই পর্যায়ের ব্যায়ামগুলো যেন অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ না হয়। এ পর্যায়ের মধ্যে গ্রন্থির আড়ষ্টতা ভাঙার জন্য শরীরের নমনীয়তা ও শ্লথ-করণের ব্যায়ামগুলো থাকা চাই। একই উদ্দেশ্যে জিম্‌নাষ্টিক্‌স ও খেলাও চলতে পারে। তবে পর্যায়ের ব্যায়াম যেন অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ বা উত্তেজনাকর না হয়।

(গ) তৃতীয় পর্যায় হল শিক্ষাক্রমের প্রধান পর্যায়, এ পর্যায়ের লক্ষ্য ফুটবলের কায়দাকরণ ও কলাকৌশল শেখানো, এবং এতে খেলোয়াড়দের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতিও হবে।

(ঘ) চতুর্থ বা শেষ পর্যায় খেলোয়াড়দের শ্রান্তি দূর করবার জন্য—এ পর্যায়ে পড়ে ধীরগতিতে দৌড়, হাঁটা ও অন্যান্য ব্যায়াম যাতে বেশ গা ছেড়ে দেওয়া যায়। কোচ্‌ তখন গোটা শিক্ষাক্রমের হিসেব-নিকেশ কষে ভুল-ত্রুটিগুলো দেখাবেন ও পরবর্তী খেলাগুলোর কথা জানিয়ে দেবেন।

প্রত্যেক অনুশীলনীতেই ট্রেনিংয়ের মেহনত ক্রমান্বয়ে বাড়াবার বা কমাবার নীতি খুব কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে—প্রত্যেক পর্যায়ে কঠিন পরিশ্রমের পরে-পরেই বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা চাই। এ নীতির মানেই হল অনুশীলনী নিভুলভাবে বাছাই করা ও সাজানো।

অনুশীলন সূচী পরিকল্পনা করার সময় ব্যায়াম ও তা পালন করার পদ্ধতিও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যায়াম কতোবার অনুষ্ঠিত হল, সেগুলো কতোখানি জটিল, কতো তাড়াতাড়ি করা সম্ভব তার ওপর নির্ভর করবে তৎপরতার পরিমাণ।

মনে রাখা দরকার—সহক্ষমতা বাড়ানোর ব্যায়ামের আগে গতিবেগ বাড়ানোর ব্যায়াম থাকা দরকার ; দৈহিক শক্তি ও সহক্ষমতার ব্যায়ামগুলো সবচেয়ে ভালো হয় শিক্ষাক্রমের শেষে দিলে। তা ছাড়া, একবার পুরোপুরি শ্রান্তি দূর করে নেওয়ার পর তবেই পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যায়াম ও মনোবল বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো শেখানো যায়।

শ্রমসাপেক্ষ ব্যায়ামের পরে পরেই অনুশীলনী শেষ করা উচিত নয়। অনুশীলন-সূচী শেষের দিকে সর্বদাই শরীরের শ্রান্তি বিদূরণ করার ব্যায়াম থাকা দরকার।

অনুশীলনের সময়-সূচীর পাঁচ-শতাংশ দখল করে থাকে প্রারম্ভিক পর্যায়, প্রস্তুতিমূলক পর্যায় থাকে দশ-শতাংশ জুড়ে, প্রধান পর্যায় শতকরা আশি ভাগ সময় নেয় আর পাঁচ-শতাংশ সময় জুড়ে সমাপ্তিকাল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির প্রথম লক্ষণ দেখা গেলেই (যেমন অবসাদ, খেলার অবনতি, বিশেষ করে নির্ভুল নিশানা ও গতিবেগ ক্ষুণ্ণ হওয়া, ওজন হ্রাস, খিদে নষ্ট হওয়া ইত্যাদি) ট্রেনিংয়ের বোঝাটা খানিকটা কমিয়ে দেওয়া দরকার হবে। খেলোয়াড়রা তখন অন্য ধরনের ব্যায়াম শুরু করবেন, যাতে শ্রান্তি দূর করতে সাহায্য হয়। প্রত্যেক অনুশীলনীর গুণাগুণ নির্ভর করে স্বয়ং শিক্ষাদাতার ওপর। শিক্ষাক্রম তৈরি করার আগে শিক্ষাদাতা তার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলবেন। প্রত্যেকটা অনুশীলনী, বিশেষ করে নতুন অনুশীলনীগুলো সযত্নে নির্ধারণ করতে হবে, নয়তো খারাপভাবে শুরু করার ফলে গোটা শিক্ষাক্রমই বানচাল হয়ে যাবে।

প্রত্যেক শিক্ষাক্রমের বেশির অংশই ব্যয়িত হবে আগের অনুশীলনী-গুলোর পুনঃপুনঃ চর্চায়। এর ওপর খেলোয়াড়রা নতুন অনুশীলনী শিক্ষা করবেন।

মূল কলাকৌশল সম্পর্কে খেলোয়াড়দের চেতনা সুসংবদ্ধ করায় জন্য শিক্ষাদাতা দুর্বলতর খেলোয়াড়দের দিকে যথেষ্ট নজর দেবেন ও তাঁদের

সাহায্য করবেন ; এর জন্য চাই প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে ব্যক্তিগতভাবে চেনা ও তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা থাকা।

শারীরিক বিকাশের দিক থেকে খেলোয়াড়দের মধ্যে যে ইতরবিশেষ আছে শিক্ষাদাতা সেদিকে মনোযোগ দেবেন। কারুর হয়তো সহনক্ষমতা আছে কিন্তু গতিবেগ নেই, আরেকজন হয়তো বলশালী কিন্তু চটপটে নন। এঁদের জন্য অনুশীলনী ও কার কী পরিমাণ ব্যায়াম করা দরকার তা শিক্ষাদাতাকে বুঝে নিতে হবে ও এমন ভাবে প্রত্যেকের দেহচর্চা পরিচালনা করতে হবে যাতে তাঁরা একটা প্রয়োজনীয় সাধারণ মান অর্জন করতে পারেন।

শিক্ষাদাতা সারা বছরের জন্য একটা শিক্ষাক্রমের ধারা ঠিক করবেন ও বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তা ভাগ করবেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে একমাত্র প্রত্যেকটি শিক্ষা-পর্যায়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করেই সঠিকভাবে শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা করা যায়।

খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও দোষত্রুটি সবচেয়ে ভালো ধরা পড়ে প্রবল শারীরিক, স্নায়বিক ও নৈতিক চাপের মধ্যে পড়লে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতা-মূলক খেলায়। ট্রেনিংয়ের একটি প্রধান অঙ্গ তাই এই প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলো।

প্রতিযোগিতার সময় খেলোয়াড়দের ওপর চাপ পড়ে অত্যন্ত বেশি। তাই তাঁরা কাজ ও বিশ্রাম যাতে পর্যায়ক্রমে পেতে পারেন প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদাতা সেই ব্যবস্থাই রাখেন।

নিয়মিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক—ট্রেনিং কর্মসূচী পালন করতে হবে যাতে খেলোয়াড়রা ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকেন। নিয়মিত কড়া রুটিনের বিশেষ প্রয়োজন প্রতিযোগিতার মরশুমে, যখন খেলোয়াড়দের একটানা উন্নত মান বজায় রেখে চলতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে প্রত্যেকটা ট্রেনিং পর্যায়কে সাপ্তাহিক অনুশীলন-ধারার মধ্যে ভাগ করে নেওয়াই সব থেকে ভালো ব্যবস্থা।

কাজের পরিমাণ, সময়কাল ইত্যাদি অনুযায়ী অনুশীলনীগুলোকে তিনটে স্তরে ভাগ করা যেতে পারে : ১) প্রচুর দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ (হেভি) অনুশীলনী (২) মাঝামাঝি শ্রমসাপেক্ষ ও (৩) হাল্‌কা ব্যায়ামের অনুশীলনী।

প্রতিযোগিতামূলক, ফ্রেণ্ড্‌লি, ও প্র্যাকটিস খেলাগুলোকে একটা স্বতন্ত্র

স্তর হিসাবে রাখা দরকার। কারণ এগুলো খেলতে গিয়ে স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ পড়ে। খেলা যতো গুরুত্বপূর্ণ হবে, চাপও ততই বেশি, কারণ তাতে শরীর ও মনের প্রচুর শক্তি ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন। খেলায় হেরে গেলে ট্রেনিংএ বিমুখতা ও নিরুৎসাহ ভাব আসতে পারে। অপরপক্ষে, খেলায় জিতলে খেলোয়াড়রা আরো বেশী উৎসাহ পাবেন। বন্ধুত্বমূলক ম্যাচ খেলাতেও একই ফল হয় যদিও তার প্রভাব কিছুটা কম, আর প্র্যাকটিস খেলার বেলায় আরো কম।

শক্ত (হেভি) ট্রেনিং পর্যায়ের মানেই হল প্রায় একটানা কাজ (পুরো সময়ের শতকরা প্রায় নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ সময় নিয়ে), প্রত্যেকটা অনুশীলনী তাতে পর-পর আসবে (স্বল্প দূরত্বের দৌড়, বল ছাড়া বা বল নিয়ে দৌড়ানো অবস্থায় পাস্ করা, দৌড়ানো অবস্থায় কিক্ করা, খেলা সহযোগে ব্যায়াম ইত্যাদি)। ধীর স্থিরভাবে প্র্যাকটিস করার সময় তখন থাকে না।

এই শিক্ষাক্রমে খেলাধুলা ও ফুটবল-চর্চার মেয়াদ তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট। গোটা অনুশীলনীর সময়কাল দু' থেকে আড়াই ঘণ্টা অবধি।

হেভি ট্রেনিং এর শিক্ষাক্রম মোটামুটি এই ধারায় চলতে পারে :

১। ৬০০ থেকে ৮০০ গজ দৌড় [ধীর গতি] (২ মিনিট)।

২। জিম্‌নাষ্টিক্‌স [হাঁটা] (১০ থেকে ১৫ মিনিট)।

৩। ছোট ছোট দূরত্বের দৌড়, একেকবারে ১০ থেকে ১৫ গজ অবধি [৫ ১০ বার] (৩ থেকে ৫ মিনিট)।

৪। বিভিন্ন দিকে ড্রিব্‌ল্ করা (৫-৮ মিনিট)।

৫। দৌড়ানো অবস্থায় পাস্ (১০-১৫ মিনিট)।

৬। বল নিয়ে স্বল্প দূরত্বের দৌড় ও গোলে শুট্ করা (২৫-৩০ মিঃ)।

৭। একেক পক্ষে পাঁচজন নিয়ে খেলা (৪০-৪৫ মিনিট)।

৮। শেষে একবার দৌড়, তারপর হেঁটে শ্রান্তি দূর করা (২-৩ মিঃ)।

হেভি ট্রেনিং শিক্ষাক্রম দু' সপ্তাহে একবার করে পালন করতে হয় যাতে খেলোয়াড় শ্রমসাপেক্ষ কাজের জন্য তৈরি হতে পারেন।

মাঝামাঝি ট্রেনিং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য খেলোয়াড়দের কায়দাকরণগত উৎকর্ষ ও কলাকৌশলের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা এবং তাঁদের শারীরিক ও নৈতিকভাবে উন্নত করা।

এতে অনুশীলনীগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে শিক্ষাদাতার পক্ষে খেলোয়াড়দের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা সম্ভব হয় ও প্রয়োজনমতো তাঁদের শোধরানো যায়। শিক্ষাদাতার মনোযোগ থাকা চাই খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতার দিকে ও নতুন নতুন কম্‌বাইণ্ড্‌ মুভ্‌মেণ্ট্‌ আয়ত্ত করার দিকে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে মাঝামাঝি আকারের ট্রেনিং শিক্ষাক্রম রাখা দরকার।

এ ধরনের শিক্ষাক্রমের মেয়াদ দেড় ঘণ্টা থেকে দু' ঘণ্টা অবধি। একটা মোটামুটি খসড়া দেওয়া হল :

১। ৩০০-৪০০ গজ ধীরগতিতে দৌড় (২-৩ মিনিট)।

২। সাধারণ উৎকর্ষের জন্য অনুশীলনী (১০-১৫ মিনিট)।

৩। পাঁচবার দশ গজের ছোট ছোট দৌড় (২-৩ মিনিট)।

৪। বল থামানো ও পাস্‌ করা (১০-১৫ মিনিট)।

৫। থ্রো-ইন (১০-১৫ মিনিট)।

৬। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কিক্‌ করা [ফরোয়ার্ড ও হাফ ব্যাকদের জন্য], জমিতে বল রেখে নির্ভুলভাবে কিক্‌ করা [ব্যাকদের জন্য], গোল বাঁচানো [গোলরক্ষকের কাজ] (২৫-৩০ মিনিট)।

৭। কৌশলগত চাল শেখা (১৫-২০ মিনিট)।

৮। খেলা চর্চা, দু'জনের বিপক্ষ তিনজন (২০-৩০ মিনিট)।

৯। শ্রান্তি দূর করার জন্য ব্যায়াম।

হাল্‌কা ট্রেনিং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হল খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট উৎকর্ষের মান বজায় রাখা। এধরনের শিক্ষাক্রমের কর্মসূচী সপ্তাহে দু'বার কি চারবার রাখা যেতে পারে। খেলার আগে টিমকে যখন একবার অনুশীলনী চর্চা করিয়ে দিতে হয় তখন, অথবা যখন খেলোয়াড়রা অবসাদের ভাব দেখাচ্ছেন তখনও এমনি ধরনের হাল্‌কা শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা চলে।

শিক্ষাক্রমের মেয়াদ এক ঘণ্টা।

হাল্‌কা ট্রেনিং-এর একটা খসড়া দেওয়া হল :

১। ধীরগতিতে ২০০-৩০০ গজ দৌড় (১-২ মিনিট)

২। সাধারণ উৎকর্ষের জন্য অনুশীলনী (১০-১৫ মিনিট)

৩। থ্রো-ইন (১০-১৫ মিনিট)।

৪। খেলা (বাস্কেটবল, ভলিবল ইত্যাদি) অথবা ২-৩ মাইল লম্বা-হাঁটা বা দৌড় (২০-৩০ মিনিট)।

৫। শ্রান্তি দূর করার জন্য ব্যায়াম।

এই ট্রেনিং-এ এমন ধরনের অনুশীলনী রাখা হয় যাতে অতিরিক্ত স্নায়ু বা পেশীর জোর দরকার হয় না এবং যাতে জখম হবার ভয় কম।

সাপ্তাহিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে একদিন অন্তত প্র্যাকটিস খেলা থাকতেই হবে। কারণ ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা প্র্যাকটিস খেলা।

সাপ্তাহিক শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা করবার সময় শিক্ষাদাতাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুটো অনুশীলনী চর্চার মাঝে খেলোয়াড়রা দম ফিরে পাবার মতো যথেষ্ট সময় পান। সুতরাং নিচের পদ্ধতিতে অনুশীলনী ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাগুলো সাজাতে পারলেই ভালো হয়:

একেকটা খেলার পর খেলোয়াড়দের সারাদিন বিশ্রাম করার সুযোগ দিতে হবে। খেলার পর দ্বিতীয় দিনের মধ্যে খেলোয়াড়রা নিশ্চয় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। সুতরাং পরবর্তী দিনগুলোতে শক্ত, মাঝামাঝি বা হাল্কা ট্রেনিং দেওয়া চলতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে মাঝামাঝি ট্রেনিং দেবার পর তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে শক্ত কাজ দেওয়া চলে অথবা প্র্যাকটিস গেমের ব্যবস্থা করা চলে। পঞ্চম দিনে থাকা চাই মাঝামাঝি অনুশীলনী এবং ষষ্ঠ দিনে হাল্কা অনুশীলনী অথবা বিশ্রাম ও হাল্কা ব্যায়াম।

সাপ্তাহিক অনুশীলনক্রমকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে:

সপ্তাহে তিনটি অনুশীলনী-চর্চা সহ:

রবিবার—প্রতিযোগিতামূলক খেলা (শীতকালে অন্যান্য খেলাধূলা)*

সোমবার—সম্পূর্ণ বিশ্রাম

মঙ্গলবার—মাঝামাঝি অনুশীলনী চর্চা

বুধবার—শক্ত অনুশীলনী অথবা প্র্যাকটিস খেলা

বৃহস্পতিবার—বিশ্রাম ও হাল্কা ব্যা াম

শুক্রবার—মাঝামাঝি অনুশীলনী

শনিবার—বিশ্রাম ও হাল্কা ব্যায়াম

রবিবার—প্রতিযোগিতামূলক খেলা

---

* অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন দেশে এর অদলবদল হতে পারে।

সপ্তাহে দুটি অনুশীলনী-চর্চা সহ :

রবিবার—প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

সোমবার—সম্পূর্ণ বিশ্রাম

মঙ্গলবার—বিশ্রাম ও হাল্‌কা ব্যায়াম

বুধবার—প্র্যাকটিস খেলা অথবা শক্ত অনুশীলনী চর্চা।

বৃহস্পতিবার—বিশ্রাম ও হাল্‌কা ব্যায়াম

শুক্রবার—মাঝামাঝি অনুশীলনী-চর্চা।

শনিবার—বিশ্রাম ও হাল্‌কা ব্যায়াম

রবিবার—প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও অনুশীলনী-চর্চার মাঝখানে বিশ্রামের মানে অবশ্য পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়তা নয়। খেলোয়াড়রা প্রস্তুতিমূলক ব্যায়াম করতে পারেন, লম্বা দৌড় দিতে পারেন, তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট খেলতে পারেন, ইত্যাদি। এতে করে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের মান ভালো থাকবে, তাঁরা খেলার পদ্ধতি ও কৌশলগত দিকগুলো আয়ত্ত করবার জন্য অনুশীলনী চর্চা চালাতে পারবেন।

ট্রেনিং কর্মসূচী এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে শীতের পর প্রতিযোগিতা মরশুমের আগে খুব জোর খাটতে পারা যায়। বছরের শেষের দিকে কাজ ক্রমশ হাল্‌কা করে আনতে হবে।

ফুটবলের মূল কলাকৌশল ও কায়দাকরণ প্র্যাকটিস করলে, অন্যান্য খেলা-ধূলায় যোগ দিলে ও রোদ-হাওয়া-জলের মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলে খেলোয়াড়রা নিজেদের উচ্চ মান বজায় রাখতে পারবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতি ও শিক্ষাক্রমগুলো অনুসরণ করে শিক্ষাদাতা তাঁর ফুটবল খেলোয়াড়দের সর্বতোমুখী শারীরিক, কৌশলগত ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করতে পারবেন।

এবার ট্রেনিং কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শরীরচর্চার ট্রেনিং *

খেলোয়াড়দের সুষ্ঠু মান বজায় রাখবার জন্য ফুটবল ছাড়াও জিম্‌নাষ্টিক্‌স, দৌড়-ঝাঁপ, ভারোত্তলন অথবা অন্যান্য খেলাধূলা চলতে পারে।

* বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা-সূচীর অদলবদল হতে পারে।

শীতকালে এই উদ্দেশ্যে যেসব খেলাধূলা করা হয়ে থাকে সেগুলো হল হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো, রীলে দৌড়, জিম্‌নাষ্টিক্‌স পেশী-চর্চা, সরঞ্জামসহ অথবা সরঞ্জাম ছাড়া ব্যায়াম, খেলা সহযোগে ব্যায়াম, বাস্কেট, ভলি, হকি ইত্যাদি—যাতে সহনক্ষমতা, গতিবেগ, শক্তি, তৎপরতা ও ইচ্ছাশক্তি বাড়ে সেইসব ব্যায়াম।

এ পর্যায়ে খেলোয়াড়দের শারীরিক কর্মক্ষমতা বজায় রাখবার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে তাঁদের মূলগত কায়দা-কৌশল শেখার পক্ষে সুবিধা হয়।

প্রথম চার পাঁচটা অনুশীলনীতে প্রধানত এমন ব্যায়াম থাকে যার লক্ষ্য সাধারণ শারীরিক উন্নতি। পরে এই ব্যায়ামগুলোরই স্থান গ্রহণ করে ফুটবল কৌশল ও কায়দাকরণের শিক্ষা।

শীতের পরও একই ব্যায়াম বহাল থাকে, তার অনুশীলনীগুলো তখন অনেক বেশি শ্রমসাপেক্ষ করে তোলা হয়, দৌড় ও লাফ-ঝাঁপের ওপর, বিশেষ করে দৌড়, লাফ ও রীলে রেসের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়; স্বল্প ও দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় ও লাফের ওপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় এইজন্য যে তাতে সহনক্ষমতা ও গতিবেগ বাড়ে। বেশির ভাগ অনুশীলনীতে থাকে ৫, ১০, ১৫, ২০ বা ৩০ গজ দূরত্বের দৌড় ও লাফ।

শরীরচর্চার ট্রেনিং-এর মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও পরীক্ষাও আসে। যে-সব খেলায় প্রচুর সহনশক্তি ও গতিবেগের দরকার (যেমন প্রতিযোগিতা হিসাবে স্বল্প দূরত্বের দৌড় বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়)—যে সব খেলা এই পর্যায়ের প্রথম দিকে দেওয়া ঠিক নয়। খেলোয়াড়দের ধীরে ধীরে কঠিন কার্যক্রমের মধ্যে আনতে হবে যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে সহজেই প্র্যাকটিস খেলা খেলতে পারেন (ক্লান্তি বা পেশীর বেদনার অনুযোগ যেন না শুনতে হয়)।

গ্রীষ্মের মুখোমুখি ট্রেনিং-এর উচ্চতম পর্যায় শুরু হয়। প্রতিযোগিতার সাফল্য সাধারণত এই পর্যায়ের সুদক্ষ ট্রেনিং-এর ওপরেই নির্ভর করে।

এ সময়ে ফুটবল খেলোয়াড়রা আসল প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য তৈরি হতে থাকে। প্রায়ই প্র্যাকটিস খেলা খেলতে হয় বলে চাপ অত্যন্ত বেশি পড়ে। খেলোয়াড়দের বহাল তবিয়তে রাখা আসল উদ্দেশ্য হলেও ফুটবলের কায়দা-করণ ও কৌশল শিক্ষার দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশি।

শীত আর বসন্তকালের পর যখন আসল পর্যায় শুরু হয় তখন খেলোয়াড়দের চূড়ান্ত সীমায় পৌছাবার কথা। তখন ব্যক্তিগত কোচিং-এর ওপর যথেষ্ট নজর দিতে হবে কারণ এই সময় থেকেই খেলোয়াড়েরা যার-যার নিজেদের নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী বিশেষভাবে শিক্ষা পেতে শুরু করেন।

শরীর-চর্চার পরিমাণও এ সময় বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে শুরু হয় মূলগত কায়দা-কানুন ও কলাকৌশলের ট্রেনিং। এইভাবে, দৌড়ের সঙ্গে চলে ড্রিবলিং; লাফের সঙ্গে বল হেড করা, মাথা ও পায়ের সাহায্যে ভলিবল, বিভিন্ন কায়দায় বল ছোঁড়া ইত্যাদি।

গতিবেগ ও সহন-ক্ষমতা বাড়াবার জন্য দ্রুতগতিতে স্বল্প-দূরত্বের দৌড় ও হাইজাম্পের ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

মাঝে মাঝে তদারকী পরীক্ষা করলে শারীরিক বিকাশের দিক থেকে তা ফলপ্রদ। শিক্ষাদাতা খেয়াল রাখবেন যাতে খেলোয়াড়রা একটানা উন্নতি করতে পারেন, অথচ প্রত্যেকটা অনুশীলনীর পর যেন তাঁরা যথেষ্ট বিশ্রাম পান। এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলা ও বিশ্রামের পর্যায়গুলো যেন পর পর যথোচিতভাবে সাজানো হয়। গরমে দুপুর রোদে অনুশীলনীর ব্যবস্থা করা ঠিক নয়।

অবসাদের লক্ষণ নজরে পড়লে শিক্ষাদাতা বল প্র্যাকটিসের বদলে শারীরিক চর্চাকে স্থান দেবেন, বিশেষ করে খেলার আগের কটি দিনে যাতে খেলোয়াড়দের খেলার আগ্রহ নষ্ট হয়ে না যায়।

প্রতিযোগিতা মরশুমের শেষের দিকে অনুশীলনীগুলো ক্রমান্বয়ে সহজতর হয়ে আসবে।

বল-প্র্যাকটিস কমিয়ে দিয়ে এই সময় সাধারণ শরীরচর্চা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

শীতের সময় ফুটবল খেলোয়াড়রা হকি খেলা বা অন্যান্য খেলা ও জিম্‌নাষ্টিক্‌সে আত্মনিয়োগ করবেন।

সাধারণ শারীরিক উন্নতির জন্য ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে ব্যায়ামের যথেষ্ট মূল্য আছে, খেলোয়াড়দের সর্বাঙ্গীন শারীরিক বিকাশের জন্য তা প্রয়োজনীয়। এতে পেশী-ব্যবস্থার উন্নতি হয়। শরীরের গ্রন্থিগুলো জোরদার হয়, নমনীয়তা বাড়ে। আঙ্গিক যোগাযোগ ও ভারসাম্য ক্ষমতা বাড়ে, হৃৎপিণ্ড, রক্ত চলাচল ও শ্বাসযন্ত্রের কাজ উন্নত হয়।

দাঁড়িয়ে থেকে বা সচল অবস্থায়, সরঞ্জাম নিয়ে অথবা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা একজন সহযোগীর সঙ্গে মিলে এই ব্যায়ামগুলো করা যেতে পারে।

ব্যায়ামগুলোকে বাছাই করার সময় বিশেষ মূল্য দিতে হবে, সেইগুলিকে যাতে ফুটবলের আনুষঙ্গিক ক্রীড়াগুলোর ক্ষেত্রে নিপুণতা বাড়ে (যেমন দৌড়, লাফ, ছোঁড়া-ছুঁড়ি, উঁচু জায়গায় বেয়ে ওঠা ইত্যাদি)।

অন্য যে কোনো খেলোয়াড়ের মতো ফুটবল খেলোয়াড়েরও থাকা চাই দৈহিক শক্তি, সহনক্ষমতা, গতিবেগ ও তৎপরতা। কিন্তু তাঁর প্রধান বিশেষত্ব দৌড়ের গতিবেগ ও বল ব্যবহারের কেরামতি। কারণ ফুটবল খেলার সময় বল নিয়ে অথবা না নিয়েই খেলোয়াড়কে বার বার দৌড়াতে হয়। দৌড়ানোর সঙ্গে থাকে বল কেড়ে নেবার জন্য লড়াই ও গোলের দিকে বল শুট করা।

ব্যক্তিগত ট্যাক্‌লিং-এর জন্য কাঁধ নিয়ে চার্জ করা, বিপক্ষের পা থেকে বল ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদির মতো যথেষ্ট শক্তি থাকা চাই দেহে। ফুটবল কৌশলের জন্য যথেষ্ট তৎপরতা বা চটপটে ভাবও থাকা চাই।

ট্রেনিং কর্মসূচীর একটা বড়ো অংশে থাকা চাই **গতিবেগ** বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়ামাদি। এই ব্যায়ামগুলো ছাড়াও বাস্তবে খেলার সময় অথবা কলাকৌশল প্র্যাকটিস করার সময় গতিবেগ বাড়বে।

গতিবেগ বাড়াবার জন্য নিচের ব্যায়ামগুলো করা যেতে পারে :

দৌড়-ঝাঁপ—স্বল্প দূরত্বের দৌড় (দ্রুত স্টার্ট দিয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চট্ করে গতিবেগ থামিয়ে দেওয়া, হাই ও লঙ্ জাম্প, দৌড়ানো জাম্প এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে 'থ্রো' করা)।

ডিগবাজি খাওয়া, লীপ-ফ্রগ খেলা।

সবলতা বাড়াবার জন্য বিশেষ রীলে দৌড় ; বাস্কেট, ভলি।

গতিবেগ নির্ভর করে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া, শক্তি ও পেশীর স্থিতিস্থাপকতা, গ্রন্থির নমনীয়তা, সহনক্ষমতা, মানসিক শক্তি ও খেলোয়াড়ের দক্ষতার ওপর।

গ্রন্থির নমনীয়তা ও পেশীর স্থিতিস্থাপকতা (বাড়ানো কমানোর) দ্বারা গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব। নমনীয়তার ব্যায়ামগুলো হল : হাত দোলানো (এক সঙ্গে ও পর পর)—সামনে-ওপরে, নিচে-পছনে—কব্জি ও বাহুর চক্রাকার আবর্তন।

পা দোলানো (একসঙ্গে ও পর পর) : বসা অবস্থায়, দাঁড়িয়ে বা শুয়ে—সামনে, পেছনে ও পাশের দিকে, ভাঁজ করে ও সিধে টান-টান করে। লাথি ছোঁড়া—সামনে, পেছনে ও পাশের দিকে।

শরীর ঝোঁকানো (সামনে ও পাশের দিকে),শরীর চক্রাকারে ঘোরানো।

লাফিয়ে শরীর বাঁকানো। ওপরে ও পেছনে হাত দোলানো ও পিছন দিকে পা-দোলানো।

অনাবশ্যক চাপ এড়াবার জন্য খেলোয়াড় শুধু খেলার কায়দা-কৌশলগুলো আয়ত্ত রাখার দিকেই নজর রাখবেন। প্রতিযোগিতার সময় মানসিক আবেগ দমন করার মতো ও জোর করে নিজেকে তৎপর করে তোলার মতো ইচ্ছাশক্তি বাড়াবারও চেষ্টা করতে হবে।

দেহকে শিথিল করার ক্ষমতাও গতিবেগের ব্যাপারে একটি বড়ো কথা। শরীর শিথিল করার জন্য নিচের ব্যাপারগুলো করা যেতে পারে : সামনের দিকে খানিকটা দেহ ঝুঁকিয়ে কাঁধ-জোড়া ওঠানো ও নামানো। আল্‌গা বাহুদুটো অনায়াসে দোলানো ও ঝাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ দুটোকে যথাসম্ভব আল্‌গা করে রাখা।

মাথার ওপর বা পাশের দিকে হাত তোলা ; হাত আল্‌গা করে দু'পাশে ছেড়ে দেওয়া।

শরীর পাশের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়ে ঝুলে-পড়া শিথিল বাহু ও হাত দুটো ঝাঁকানো।

ঝোলানো হাত দুটো আল্‌গা করে দুলিয়ে দেহকাণ্ডটা এ-পাশ ও-পাশ মোড়ামুড়ি করা।

পা ফাঁক করে, দেহকাণ্ড সামনে ঝুঁকিয়ে, দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে শরীর ও বাহু আল্‌গা করে দেওয়া।

বেঞ্চের ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে আরেকটা পা দোলানো। আল্‌গা করে দোল্যানো অথবা ঝাঁকানো।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে শরীর ও হাত আল্‌গা করে অবশেষে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়া।

গতিবেগ, সহনক্ষমতা বা তৎপরতা বাড়ানোর ব্যাপারে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন। দৈহিক শক্তির ব্যায়ামের মধ্যে ভারোত্তলন বা পেশীবর্ধক খেলাগুলো পড়ে।

ঘাড়, দেহকাণ্ড, পা ও বাহুর পেশীকে শক্ত করার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ কিক্ করা ও ট্যাক্‌ল করার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব সমধিক।

ব্যায়ামগুলো এই ধরনের : এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে বা সচল অবস্থায়, সঙ্গী নিয়ে বা একা, সরঞ্জামসহ (ডাম্বেল, বারবেল ইত্যাদি) অথবা বাদ দিয়ে, জিম্‌নাষ্টিকের সাজসরঞ্জাম নিয়ে (হরাইজণ্টাল বার, প্যারালেল বার, রিং, দড়ি-মই ইত্যাদি)। দাঁড়িয়ে হাইজাম্প ও লং জাম্প, ডিগবাজি।

ট্রেনিং-এর প্রধান পর্যায়ের চেয়ে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়েই শক্তিবর্ধক ব্যায়ামগুলো করা ভালো।

ফুটবল খেলোয়াড়দের আরেকটি প্রয়োজনীয় জিনিস সহ্যগুণ। বিভিন্ন গতিবেগে হাঁটা বা দৌড়ানো, ৪০-৪৫ মিনিট ধরে তীব্রবেগে স্বল্প দূরত্বের দৌড়, বিভিন্ন সময়ের মেয়াদ একটানা দৌড়ানো বা হাঁটা।

সহনক্ষমতার ফলে খেলোয়াড় খেলার সময় দীর্ঘকাল কঠিন পরিশ্রম করতে পারেন ; দীর্ঘ সময় নিয়ে নানা ধরনের ব্যায়ামের দ্বারা এ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। যাঁরা প্রথম শুরু করেছেন তাঁরা বিভিন্ন গতিবেগের ব্যায়ামের দ্বারা সহনক্ষমতা বাড়াতে পারেন। অন্যান্য খেলাতে, ফুটবলের কলাকৌশল অভ্যাসের মধ্যে, ও বাস্তব প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই সহন-ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব।

একটানা মেহনত ও বিভিন্ন গতিবেগে দৌড়ানোর মধ্যে খেলোয়াড়কে অভ্যস্ত হতে হবে। সেইজন্য অস্বাভাবিক সময় নিয়ে খেলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁদের ফের ব্যায়ামগুলোর পুনঃচর্চা করতে হবে, কাজের মধ্যে অবসরের পরিমাণ যেন খুব কম হয় ও ট্রেনিং-চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যায়ামগুলোর যেন পরিমাণগত তারতম্য হয়।

সহনক্ষমতা আয়ত্তের ব্যায়াম শেষ হবার পর খেলোয়াড়ের দম ফিরে পাবার সময় পাওয়া চাই।

সহনক্ষমতা বাড়াবার জন্য দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়, দূরপাল্লার দৌড়, হাঁটা, দাঁড় টানা, সাইকেল চড়া ইত্যাদি অভ্যাস করতে পারেন।

প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সহনক্ষমতা-সম্পর্কিত ব্যায়ামের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রধান পর্যায়ে আরো কঠিন ও দীর্ঘতর অনুশীলনের ভেতর দিয়ে সহনক্ষমতা বাড়ানো ও বজায় রাখা হয়।

তৎপরতা অর্থাৎ চট্‌পট্‌ সহজেই চলাফেরা করার ক্ষমতা ফুটবল কলা-কৌশল আয়ত্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত দরকারী জিনিস। এই ব্যায়াম-গুলোতে তৎপরতা বাড়ে।

পা, বাহু ও দেহকাণ্ডের সাহায্যে একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করতে হবে। সাজসরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়াম (স্কিপিং-রোপ, মুগুর ভাঁজা), ডিগবাজি, বাস্কেট ও ভলিবল। যৌথ রীলে দৌড়। জিম্‌নাষ্টিক সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়াম ট্রিপল্‌ জাম্প। হপ্‌স্টেপ জাম্প। দাঁড়িয়ে এবং দৌড়ানো অবস্থায় লং-জাম্প। ডিস্‌কাস্‌ ছোঁড়া। শট পুট্‌। ডাইভ্‌ দেওয়া।

অনুশীলনীর প্রথম দিকে তৎপরতা-সংক্রান্ত ব্যায়ামগুলো রাখা চাই যাতে খেলোয়াড়েরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার আগেই ব্যায়াম সেরে ফেলতে পারেন। ট্রেনিং-এর প্রধান পর্যায়ের তুলনায় প্রস্তুতিমূলক পর্যায়েই তৎপরতার ব্যায়ামের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়।

অনুশীলনীর মধ্যে এ ছাড়া আরো অন্যান্য ব্যায়ামও থাকতে পারে যাতে খেলোয়াড়দের শরীরের সামগ্রিক উন্নতি করা সম্ভব হয়।

জিম্‌নাষ্টিকস্‌। জিম্‌নাষ্টিকের সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রাথমিক ও উন্নত-স্তরের ব্যায়াম।

ডিগবাজি ইত্যাদি। সামনে ও পেছনে ডিগবাজি খাওয়া, হাত ও মাথার ওপর দাঁড়ানো।

দৌড় ঝাঁপ। স্বল্প ও মাঝারি দূরত্বের দৌড়। দাঁড়িয়ে অথবা ছুটন্ত অবস্থায় হাইজাম্প লং-জাম্প। শট পুট্‌, ডিসকাস ছোঁড়া।

সাঁতার। যাঁরা সাঁতার কাটতে পারেন না তাঁদের জন্য সাঁতারের স্ট্রোক্‌গুলো শেখা (গুঁড়ি মেরে দু'পাশে হাত ছোঁড়া)। যাঁরা সাঁতার জানেন তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র স্টাইল অনুযায়ী সাঁতার দেবেন।

খেলা। বাস্কেট, ভলি নিয়ে প্র্যাকটিস।

দাঁড় টানা।

সাইকেল চড়া। অচেনা রাস্তায়, বন-জঙ্গলের রাস্তায় ও মফঃস্বলে সাইকেল-ভ্রমণ।

টেকনিক্‌ বা কায়দাকরণ শিক্ষা

কায়দাকরণ শেখা ও আয়ত্ত করার জন্য প্রস্তুতির পর্যায়কে ব্যাপকভাবে

কাজে লাগানো হয়। ব্যায়ামাগারে ও তার বাইরেও অনুশীলনীগুলি চালানো হয়ে থাকে।

ব্যায়ামাগারে অনুশীলনীর জন্য (জাল, ঝুলন্ত বল, কাত করা পর্দা, বল কণ্ট্রোলারের বিভিন্ন প্রকরণ ইত্যাদি) বিশেষ সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। দু জন, তিনজন বা তার চেয়ে বেশি লোক মিলে অনুশীলনী চলতে পারে। অনুশীলনীর মধ্যে থাকা উচিত খেলা সহযোগে ব্যায়াম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খেলা (টেনিস ইত্যাদি)।

বহিরাঙ্গনের (আউটডোরের) অনুশীলনীর মধ্যে থাকা উচিত দৌড়ানোর ব্যায়াম (রিলে-দৌড়, ফুটবল নিয়ে খেলা ইত্যাদি)।

শীতকালের ক্রীড়াচর্চারই জের চলতে থাকে শীত-পরবর্তী কালের শিক্ষা-সূচীর মধ্যে। তবে বিশেষ সাজসরঞ্জামগুলি তখন ব্যবহার করা হয় আরো বেশি করে (যেমন স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য গোল কাঠের দেয়াল ইত্যাদি)। ফুলবল খেলার কৌশলগুলি আয়ত্ত করার জন্য তখন আরো কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। শিক্ষা-সূচীর মধ্যে থাকা উচিত প্র্যাকটিস খেলা ও তদারকী ব্যবস্থা।

বল প্র্যাকটিস জিনিসটা ক্রমেই কঠিনতর ও জটিলতর হয়ে ওঠা চাই। শীতকালের ট্রেনিং-এর সময় সব খেলোয়াড়ই মোটামুটি একই ধরনের শিক্ষা নিয়ে থাকেন· কেবল গোলরক্ষককে কিছু অতিরিক্ত বিশেষ বিষয় শিখতে হয়। শীতের পরবর্তী মরশুমে খেলোয়াড়রা দলের যে অবস্থানে খেলেন তদনুযায়ী বিশেষজ্ঞতা অর্জন করার চেষ্টা শুরু করেন।

এসময়ে খেলোয়াড়রা যাতে কলাকৌশলে আরো পটু হয়ে ওঠেন তার জন্য শিক্ষাদাতা বিশেষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। প্রতিপক্ষের বাধার সম্মুখীন হয়ে আরো দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বল প্র্যাকটিস ইত্যাদি শেখাতে হবে। খেলোয়াড়দের যতবার সম্ভব বহিরাঙ্গনে (আউটডোর) খেলার জন্য নিয়ে যেতে হবে।

ব্যায়ামাগার ইত্যাদিতে বল প্র্যাকটিসের জন্য ছ' থেকে আটজন নিয়ে এক-একটি দল করাই সব থেকে ভালো। আউটডোরে অনুশীলনীর জন্য তার চেয়ে বেশি লোক নিয়ে দল করা চলতে পারে। দলটি কি ধরনের হবে তা খেলার অনুশীলনীর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। বহিরাঙ্গনের অনুশীলনী শুরু করবার সময়ে মাঠের অবস্থা, আবহাওয়া এসব বিষয়

সতর্কভাবে বিবেচনা করে শিক্ষক তাঁর অনুশীলনীর পরিকল্পনা তৈরি করবেন। কোনো কঠিন বা আকস্মিক খেলার কায়দা শুরু করার আগে খেলোয়াড়েরা ভালো করে শরীর শিথিল করে নেবেন। কিক্ করা, প্র্যাকটিস আরম্ভের আগে পরস্পরের সহযোগিতায় ড্রিবলিং, পাকড়ানো ইত্যাদি অন্যান্য বল প্র্যাকটিসের জিনিসগুলিও শিখে নিতে হবে।

প্রকৃত খেলার মতো (মাঠ, খোলা আবহাওয়া ইত্যাদি) মোটামুটি অবস্থাগুলি ঠিক রেখেই কলাকৌশলগুলি অভ্যাস করতে হবে। খেলোয়াড়দের আলাদা আলাদাভাবে শেখানোর জন্য শিক্ষাদাতাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখতে হবে যাতে খেলোয়াড়রা কলাকৌশলে দক্ষ হয়ে উঠতে ও তাঁদের ভুলত্রুটি দূর করতে পারেন।

খেলার প্রধান পর্যায়ের মধ্যেই খেলোয়াড়রা কলাকৌশল আয়ত্ত করার প্রধান কাজ চালিয়ে যাবেন। অবশ্য বল প্র্যাকটিসের ধরনটা এ সময় একটু অন্য রকমের হবে খেলোয়াড়দের এখন বেশ পরিকল্পিতভাবে দৈহিক শক্তি, নির্ভুল কিক্, দ্রুতবেগে দৌড় ইত্যাদির সমন্বয় করে খেলতে হবে।

প্রধান পর্যায়ের মধ্যে খেলোয়াড়রা যাতে তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন তার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে বল প্র্যাকটিস করার স্বাধীনতা বেশী করে দেওয়া উচিত।

প্র্যাকটিস কিংবা প্রতিযোগিতামূলক অনেকগুলি খেলার মধ্য থেকেই শিক্ষাদাতা খেলোয়াড়দের ভুলভ্রান্তিগুলি ধরতে ও তা শুধরে দিতে পারবেন।

বল প্র্যাকটিসের আগে দূরপাল্লার দৌড় বা দৈহিক শক্তি ও দ্রুততা বাড়ানোর ব্যায়াম—যাতে প্রচুর পেশী সঞ্চালনের দরকার হয়, সেগুলি করা সঙ্গত নয়।

প্রধান পর্যায়ের মধ্যে খেলার নতুন নতুন চাল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সাধনের কায়দা কি তা শিক্ষা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলার মরশুমের পর কলাকৌশল প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা অবহেলা করা উচিত নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার খেলোয়াড়রা এ সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ও খেলা শেখার উন্নতিসাধনে এখন তাঁরা খুবই অসমর্থ, তাই শিক্ষক মশাই তাঁদের খেলার দক্ষতা বজায় রাখা ও নৈপুণ্য বাড়িয়ে যাবার জন্য এখন তাঁদের মধ্যে প্র্যাকটিস গেম বা ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ গোছের প্রতিদ্বন্দ্বী খেলার ধারা চালু রাখতে পারেন।

খেলোয়াড়দের খেলার প্রেরণা বাড়ানোর জন্য ট্রেনিং-এর গোটা সময়টা ধরেই মাঝে মাঝে তাঁদের নৈপুণ্যের পরীক্ষা নেওয়া আবশ্যক।

ফুটবল খেলার সব কটি মৌলিক কলাকৌশল যেহেতু একেবারে শেখানো সম্ভব নয়, এজন্য ধীরে ধীরে ও মোটামুটি নীচের ধারায় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়া উচিত :

পায়ের পাতার পিঠের ওপর, ভেতর ও বাইরের দিক দিয়ে, পায়ের ডগা দিয়ে সোজা কিক্ করা এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে উঠে হেড করা।

পায়ের পাতার ভেতর ও বাইরের দিক দিয়ে, বুক ও তলপেট দিয়ে বল ঠেকানো।

বল নিয়ে ছোটবার বিভিন্ন পদ্ধতি।

বল থ্রো করা।

বল কাড়াকাড়ি বা ট্যাক্লিং।

কিক্ : ভলি ও হাফ ভলি কিক্, নানা ধাঁচের 'ট্যারচা' কিক, মাথা টপকানো কিক্ করা, পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিছন দিকে কিক্ করা।

পা ও দেহকাণ্ড দিয়ে চাতুরীপূর্ণ চাল।

মাথা, উরু ও পায়ের ডগা দিয়ে বল থামানো।

অবশ্য খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে কে কতটা ভালো শিখবেন : কেউ কেউ খেলার দক্ষতা আয়ত্ত করেন তাড়াতাড়ি, কারো বা প্রচুর চেষ্টা করতে হয়।

ট্রেনিং-এর দ্বিতীয় বছরে গোলরক্ষক আরো দুটি খেলার কায়দা আয়ত্ত করেন : এ দুটি হল প্রতিপক্ষের আক্রমণকারীর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বল ঠেকানো ও ঝাঁপ দিয়ে বল ধরা।

যে সব ফুটবল খেলোয়াড় দ্রুত প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হতে চান তাঁরা তার জন্য অতিরিক্ত শিখতে পারেন। ছুটির ঘণ্টায় তাঁরা বলের ভার ও পায়ের উপর বার বার ফিরে আসা বল কিক্ মেরে মেরে এবং নানা ধরনের কিক্ প্র্যাকটিস করতে পারেন।

দেহ শিথিল করার গোটা কতক ব্যায়াম অনুশীলনীর পর খেলোয়াড় বলটিকে একটা তিন ফুট দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে নেবেন ও দড়ির একটি প্রান্ত ধরে, বল নিয়ে নানা ভাবে খেলতে থাকবেন। তিনি পায়ের নানা জায়গা

দিয়ে বলে কিক্ করবেন, বল নিয়ে নানা কসরত করবেন ও মাথা বা পায়ের সঙ্গে বলের নানা ভারসাম্যের অনুশীলনী অভ্যাস করবেন ইত্যাদি। এই প্র্যাকটিসের জন্য জায়গার দরকার হয় খুব কম।

তাড়াতাড়ি ফল পাবার জন্য খেলোয়াড় টেনিস বল বা ছোট রবারের বল ব্যবহার করবেন। একটি স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য দেয়াল যদি যোগাড় করা সম্ভব হয়, তবে তার গায়ে বল মেরে কিক্ অভ্যাস করবেন বা তার সাহায্যে বল নিয়ে পায়ের নানা কসরত অভ্যাস করবেন। টেনিস বলের কসরত অভ্যাস করার মধ্য দিয়ে উরু সন্ধির "অনুভব শক্তি" বাড়াতে পারলে, পরে আসল ফুটবল অভ্যাসের কাজ অনেক সহজ হয়ে আসবে।

খেলোয়াড় দৈনিক আধ ঘণ্টা করে এই ধরনের অভ্যাস চালিয়ে যেতে পারলে তাঁর খেলার কলাকৌশল শেখার কাজে অবশ্যই সাহায্য হবে। প্রত্যেকটি প্র্যাকটিসের পর্যায়ের শেষে গা ছেড়ে দেবার কয়েকটি অনুশীলনী থাকা উচিত।

এই অভ্যাসের খেলা দু'জনে মিলে খেললে সব থেকে ভালো হয়, কারণ তাতে বেশি উৎসাহ পাওয়া যায়।

ফুটবল মাঠের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার্য সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে আলাদাভাবে কলাকৌশল শিক্ষা

খেলার মাঠে ব্যবহারের জন্য একটা কাঠের দেয়াল সব রকমের কিক্ অভ্যাসে খেলোয়াড়দের সাহায্য করে। খেলোয়াড়ের পায়ের উপর ফিরে আসা বলে বার বার কিক্ অভ্যাস করার জন্য এই দেয়ালে বল মারা চলে। এই ভাবে দেয়ালের উপর কিক্ আরম্ভ করা চলতে পারে: প্রথমে দেয়ালের দুই থেকে তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে ও পরে এই দূরত্ব প্রায় বারো গজ পর্যন্ত বাড়ানো চলে।

বল যাতে খেলোয়াড়ের দিকে সূক্ষ্ম বা তির্যক্ কোণ করে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে ও ফিরে আসা বল খেলোয়াড় মাঝপথে আটকান, তেমনি করেও কিক্ করা চলে।

হেড্ করা ও বল পাকড়ানো অভ্যাস করার জন্যও এই দেয়াল ব্যবহার করা চলতে পারে। এই দেয়ালে বল নিক্ষেপ করে গোলরক্ষক বল ধরা ও ঘুষি মেরে সরিয়ে দেওয়া প্র্যাকটিস করতে পারেন।

খেলোয়াড় বল নিয়ে ড্রিবলিং করা ও গোল খুঁটির ধার দিয়ে কাত হয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অভ্যাস করতে পারেন।

ফুটবলের টেকনিক্ বা কলাকৌশল শেখার জন্য খেলোয়াড়েরা নিচের জিনিসগুলি অভ্যাস করতে পারেন।

কিক্ করা—(১) থেমে থাকা বা খেলোয়াড়ের সামনে আস্তে গড়িয়ে আসা বলে (পায়ের পাতার পিঠ, পায়ের ডগা ইত্যাদি দিয়ে) কিক্ করা।

(২) নানারকম গতিতে খেলোয়াড়ের সামনে (ডান দিক বা বাঁ দিকে) গড়িয়ে চলা বলে ডান বা বাঁ পায়ে কিক্ করা।

(৩) লাফ খেয়ে ওঠা বলে ভলি বা হাফ ভলি কায়দায় ডান বা বাঁ পা দিয়ে কিক্ করা।

(৪) খেলোয়াড়ের সামনে (ডান দিকে বা বাঁ দিকে) লাফিয়ে চলা বলে ডান বা বাঁ পা দিয়ে কিক্ করা।

(৫) ছ'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অনবরত পরস্পরের কাছে বল পাস্ করা, এতে তাদের পালা করে উভয় পা ই ব্যবহার করতে হবে।

(৬) লাফিয়ে ওঠা কোনো বলে ডান পা একবার বাঁ পা একবার, এইভাবে পর পর কিক্ করা।

(৭) ঐ, জাগ্‌লিং। বলকে শূন্যে রেখে পা দিয়ে লোফা।

(৮) প্রায় বারো গজ ব্যাসের একটি বৃত্ত করে নিয়ে, একজন খেলোয়াড় তার চারদিকে ঘুরে দৌড়বেন ও আর একজন খেলোয়াড় কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে বল 'থ্রো' করবেন। প্রথমে খেলোয়াড়টি বলে কিক্ করে ফের বৃত্তের মাঝখানে ফিরিয়ে দেবেন। প্রথম খেলোয়াড় বাঁ মুখো দৌড়ানোর সময়ে শুধু পায়ের পাতার পিঠ বা পায়ের পাতার বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করবেন, কিংবা বাঁ পা দিয়ে বল পাকড়ে ডান পা দিয়ে কিক্ করবেন, এমনি নানাভাবের কিক্ হতে পারে।

(৯) ছ'জন খেলোয়াড় একখানা দেয়াল থেকে দশ থেকে বারো গজ দূরে দাঁড়াবেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যেও সমপরিমাণ দূরত্ব থাকবে, তাঁরা পালা করে দেয়ালের দিকে কোনাকুনিভাবে অনবরত বল মারবেন। খেলোয়াড় ছ'জনের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমে বাড়ানো বা কমানো চলতে পারে।

(১০) একটা খাটো স্থানান্তর-যোগ্য গোলের উভয় পাশে বিশ গজের মতো দূরে ছ'জন কি তিনজন করে খেলোয়াড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গোলে

বল মারতে থাকবেন। খেলোয়াড়দের বিশেষ বিশেষ ধরনের কিক্ করবার মধ্য দিয়ে এই অনুশীলনীকে কঠিনতর করে তোলা চলতে পারে।

(১১) একটা খাটো স্থানান্তর-যোগ্য গোল থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে মাঝখানে তিন বা চার গজ ফাঁক রেখে দু'খানা বা তিনখানা খুঁটি পুঁতে দিতে হবে। খেলোয়াড়েরা খুঁটির পাশ কাটিয়ে ঘুরে এসে গোলে বল মারা অভ্যাস করবেন।

(১২) উভয় পায়ের পাতার পিঠের ভিতর দিক, বাইরের দিক ও উপর দিক দিয়ে নির্ভুল নিশানায় বল মারা অভ্যাস করা।

(১৩) পেনাল্টি গণ্ডি থেকে বল মারা ও কর্নার কিক্ এবং গোলে কিক্ করা।

(১৪) লাফিয়ে না উঠে সামনের দিকে হেড করা।

(১৫) ঐ, লাফিয়ে উঠে।

(১৬) না লাফিয়ে ডান বা বাঁ-পাশ থেকে বল হেড করা।

(১৭) ঐ, লাফিয়ে উঠে।

(১৮) বলকে শূন্যে রেখে দেবার জন্য হেড করা।

(১৯) বলকে হেড করে শূন্যে রাখা। বিভিন্ন উচ্চতায় বলটাকে ঠেলে দিতে হবে।

(২০) একজন খেলোয়াড় তাঁর নিজের সহযোগীকে বল ছুঁড়ে দেবেন। তিনি আবার তা হেড করে ফিরিয়ে দেবেন তাঁর সঙ্গীর দিকে।

(২১) দু'জন খেলোয়াড় পরস্পরের দিকে বল ছুঁড়ে দেবেন এবং একেকজন একেকটা বিশেষ ধরনের কিক্ করবেন।

(২২) ঐ, পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব তিন থেকে বারো গজের মধ্যে কমিয়ে ও বাড়িয়ে নিয়ে।

(২৩) দশ থেকে পনের গজ ব্যাসের একটি বৃত্তের চারদিকে একজন খেলোয়াড় দৌড়তে থাকবেন। বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপর একজন খেলোয়াড় তাঁর দিকে বল ছুঁড়বেন ও প্রথম খেলোয়াড় আবার তাঁর কাছে বলটি হেড করে ফিরিয়ে দেবেন।

(২৪) পাঁচ থেকে সাতজন খেলোয়াড় বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে হেড করে করে বলকে শূন্যের উপর রেখে দিতে চেষ্টা করবেন। একজন খেলোয়াড় বৃত্তের মাঝখানে থাকবেন।

(২৫) তিনজন খেলোয়াড় নানাভাবে অবস্থান বদলে-বদলে পরস্পরের কাছে বল হেড করতে থাকবেন।

(২৬) "হেড-ভলিবল"। এই ভলি-বলের কোর্টে থাকবে পাঁচ থেকে আটজন খেলোয়াড়ের দুটি দল। খেলার জাল ছ' ফুটের মতো উঁচুতে টাঙানো থাকবে।

(২৭) মাথা ও পা দিয়ে বল লোফালুফি করা।

বল থামানো। (১) খেলোয়াড় হাত দিয়ে শূন্যে বল ছুঁড়ে দেবেন ও পালা করে এ-পা এবং ও-পায়ের তলা দিয়ে বলকে পাকড়াবেন।

(২) একটা দেয়ালের উপর কিক্ করে বল মেরে বলটি ঘা খেয়ে ফিরে আসবার সময়ে পালাক্রমে একেকটা পায়ের পাতা দিয়ে তা পাকড়ানো।

(৩) একজন খেলোয়াড় একটি বৃত্তকে ঘিরে দৌড়তে থাকবেন আর একজন বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবেন ও আগের জন তা পা দিয়ে পাকড়ে নিয়ে আবার তাঁর কাছে কিক্ করে ফিরিয়ে দেবেন। ঐ, বিপরীত দিকে মুখ করে দৌড়ে অন্য পা দিয়ে বল কিক্ করতে হবে।

(৪) দু'জন খেলোয়াড় পরস্পরের দিকে বল ছুঁড়ে দেবেন ও বুক, উরু ইত্যাদি দিয়ে ঠেকাবেন।

(৫) একজন খেলোয়াড় অপরজনের দিকে বল ছুঁড়ে দেবেন, অপরজন ডান পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে তা আটকে একটু বাঁ দিকে ফিরিয়ে দেবেন যেন মাটিতে পড়েই লাফিয়ে ওঠে ও তিনি বাঁ পা দিয়ে তাকে কিক্ করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ঐ, অন্য পায়ের পাতা দিয়ে মেরে ও উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়ে।

বল নিয়ে ছোটা। (১) একটি সোজা লাইনের উপর পাঁচ গজ অন্তর খুঁটি পুঁতে তাকে ঘিরে নানা পদ্ধতিতে, পালা করে পা বদলে। ঐ, বৃত্তাকারে খুঁটি পুঁতে তাকে ঘিরে বল নিয়ে দৌড়নো।

(২) একটা বৃত্তের চারদিকে ডান-মুখো ঘোরা, বা বাঁ পা দিয়ে বল নিয়ে। ঐ, বাঁ দিকে ঘোরা, ডান পা দিয়ে বল নিয়ে।

৩) হাফওয়ে লাইন থেকে পেনাল্টি এলাকার দিক সোজা লাইন বরাবর ছুটে গিয়ে অবশেষে গোলে বল মারা বা কোনো সহযোগীর দিকে বল এগিয়ে দেওয়া।

(৪) এক গজের মধ্যে বল রেখে ডান পা ও বাঁ পায়ে পালা করে বল মারা।

(৫) এক থেকে চার গজ চওড়া একটা গলির মতো জায়গায় নানা গতিতে দৌড়িয়ে।

(৬) খুঁটির চারদিকে ঘুরে বল কণ্ট্রোল করা।

(৭) আঁকাবাঁকা চালে বা নানা ধরনে বাঁক ফিরে খুঁটি ঘিরে ছুটে গিয়ে গোলে বল মারা।

(৮) এলোমেলোভাবে বসানো খুঁটি ঘিরে বল নিয়ে ছোটা।

(৯) একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকায় (আড় দাঘে কুড়ি গজ বা পঁইত্রিশ গজ করে) যে কোনো দিক বরাবর বল নিয়ে ছোটা।

(১০) খুঁটি ঘিরে দৌড়ে গোলে বল মেরে দেওয়া।

ফুটবলের ছলাকলা। (১) ধড় এবং পা দিয়ে গোঁত্তা মেরে সরে যাওয়া। (ট্যাগ অথবা 'বল ধরা খেলার' মধ্যে)।

(২) বল নিয়ে ছুটে গিয়ে হঠাৎ শরীর ঘুরিয়ে নেওয়া।

বল থ্রো করা। (১) 'টাচলাইন' বা প্রান্ত রেখায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিক বা ডান দিকে সঠিক নিশানা ও দূরত্বে বল ছোড়া।

(২) ঐ, পায়ের পাতা, বুক ও মাথা লক্ষ্য করে।

(৩) গোলের কাছে বল ছোঁড়া।

গোলরক্ষকের পরীক্ষামূলক অনুশীলনী। (১) দেয়াল থেকে ধাক্কা খেয়ে ছুটে আসা বল (বিভিন্ন গতিবেগে) নানারকম উচ্চতায় হাত বাড়িয়ে ঠেকানো।

(২) দুটো বা একটা বল লোফালুফি ; পালা করে ওপরে ছোঁড়া বা একটা দেয়ালের গায়ে ছোঁড়া।

(৩) গোলরক্ষক একটি বৃত্তের চারদিকে দৌড়ান ও বৃত্তের কেন্দ্র থেকে তাঁর দিকে বল ছুঁড়ে দিলে তিনি তা ধরে আবার ছুঁড়ে ফিরিয়ে দেন।

(৪) গোলরক্ষক বল আঁকড়ে নিয়ে অন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোটেন। খেলোয়াড় সজোরে বল মাঠের ওপর ছুঁড়ে দেন। বলটির প্রথম লাফের সঙ্গে সঙ্গেই গোলরক্ষককে তা ধরে ফেলতে হবে।

(৫) গোলরক্ষক একটি দেয়ালের দিকে মুখ করে এক থেকে দু' গজ দূরে দাঁড়াবেন। একজন খেলোয়াড় গোলরক্ষকের পিছনে দাঁড়িয়ে বলটি

নানা রকম কোণ করে দেয়ালের উপর ছুঁড়ে মারবেন। বল ঘা খেয়ে ফিরে আসবার সময়ে গোলরক্ষককে তা অবশ্যই ধরতে হবে।

(৬) গোলরক্ষক জালের পাঁচ থেকে ছ'গজ দূরে দাঁড়িয়ে কিক্ করা ও বল ঘুষি মেরে সরিয়ে দেওয়া প্র্যাকটিস করেন।

কায়দাকৌশল সংক্রান্ত (ট্যাকৃটিক্যাল) ট্রেনিং

প্রস্তুতির পর্যায়ে কৌশলগত শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যায়ামাগারে—খেলা ও খেলাসহযোগে ব্যায়ামের সাহায্যে। কৌশলগত ট্রেনিং মানে কায়দা-কৌশলগত নিপুণতাকে আয়ত্ত করা (পাহারা দেওয়া বা নজরে রাখা, প্রহরী খেলোয়াড়কে এড়িয়ে যাওয়া, অবস্থান বেছে নেওয়া, পাস্ করা ইত্যাদি)। এর পরের কৌশলগত ট্রেনিং চলে ব্যায়ামাগারের বাইরে—এতে বিভিন্ন চাল ও খেলার অবস্থান শেখানো হয়।

ঠাণ্ডা অথবা বৃষ্টিবাদলের দিনে কৌশলগত শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষাদাতা যেন দীর্ঘ কর্মসূচী এড়িয়ে চলেন। ঘরে বসেই তিনি বিশদভাবে নির্দেশাদি দেবেন। শীতের সময় কায়দাকৌশল শেখাবার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি প্র্যাকটিস খেলা।

শীতের পর কৌশলগুলো আরো বিশদভাবে শেখানো যায় শীতকালে আয়ত্ত করা দক্ষতার ওপর নির্ভর করেই। খেলোয়াড়রা তখন টিমের মধ্যে তাঁদের যার যার নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী নিজেদের কর্তব্য ও কায়দা-করণগত কৌশল বুঝে নেবেন, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিপক্ষদল কী পদ্ধতি প্রয়োগ করছে তা অনুধাবন করবেন। কিক্-অফ, কর্নার, সিধে অথবা পরোক্ষ ফ্রি কিক্. এবং 'থ্রো' করা—এইগুলোর রকমারি চাল তাঁরা শিখবেন। ট্রেনিং-এর এই পর্যায়ে ফ্রেণ্ডলি খেলার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

খেলার প্রধান পর্যায়ে খেলোয়াড়রা কায়দাকরণগত কৌশল অভ্যাস করেন; নতুন কায়দা-কৌশল, সমবেত তৎপরতা ও তাদের রকমফেরগুলো শেখেন। বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া হয় যাতে একটা নির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা খেলতে সমর্থ হন। খেলা চলাকালে যে সব কৌশল সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঠে সেগুলো সমাধান করতে পারা গেল কিনা সে বিষয়েও মনোযোগ দিতে হয়।

বিশেষ ধরনের খেলা অনুশীলনী ছাড়া শিক্ষাদাতা প্র্যাকটিস্ খেলার

ব্যবস্থা করবেন যাতে কতকগুলো নির্দিষ্ট কৌশলগত সমস্যার সমাধান করা যায় (যেমন নিজেদের কাছে বল আটক করে রাখার ক্ষমতা, নিজস্ব দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অথবা বিপক্ষদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটলে কিভাবে খেলতে হবে ইত্যাদি)। পরিচিত অথবা অপরিচিত—যে-কোনো টিমের সঙ্গে খেলতে গিয়ে কী চালে বা কী প্রথায় খেলতে হবে তা খেলোয়াড়দের শেখা চাই।

প্রতিযোগিতার পর্যায় শুরু হবার আগে প্র্যাকটিস ফুটবল খেলার ভেতর দিয়ে অথবা অন্যান্য খেলায় প্রতিযোগিতা ও প্র্যাকটিসের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের কৌশলসংক্রান্ত ট্রেনিং চালিয়ে যেতে হবে।

কৌশলসংক্রান্ত ট্রেনিং-এর একটা খসড়া পরিকল্পনা দেওয়া হল :

(১) দু'জন হিসাবে পাস্ করা : মাঠের লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি কোনাকুনি, মাটিতে রাখা বল অথবা ছুটন্ত বল। কোনো একজন সহযোগীর কাছে সরাসরি পাস্ করা, খোলা জায়গায় পাস্ করা ও নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে পাস্ করা।

(২) দৌড়ানো অবস্থায় দু'জন দু'জন কিংবা তিন-তিন জনের মধ্যে পাস্ করা, অবস্থান বদল করে অথবা না করে. বিভিন্ন গতিবেগে (বলের সঙ্গে কতোবার পা ঠেকবে সেটা ঠিক করে নিয়ে)।

(৩) দু'জন অথবা তিন তিনজনের মধ্যে পাস্ করে গোলে বল মারা। আট-দশ গজ তফাতে রেখে দু-তিনজন খেলোয়াড় হাফ্ওয়ে লাইন থেকে গোলের দিকে ছুটে যাবেন, উভয় পায়েই (ষোল গজ দূরত্ব অবধি) বল পাস্ করবেন পরস্পরের কাছে এবং গোলে বল মারবেন (দৌড়াবার বেগ ও কিকের সংখ্যার কমবেশি হতে পারে)।

(৪) দু'পাশ থেকে প্রতিপক্ষের বাধার মাঝখানে দু'জনের মধ্যে বল চালাচালি করা (কিকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রেখে বাধার মাঝখানের দূরত্ব কমবেশি করা যেতে পারে, অবস্থানের অদলবদল চলতে পারে)।

(৫) একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে ছোটেন, আরেকজন সহযোগী দশ বার গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন, ছুটন্ত খেলোয়াড়টি তাঁর দিকে বল পাস্ করে দেন ও শেষোক্ত ব্যক্তি পাল্টা কিক্ করে ফেরত পাঠান।

(৬) একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে সারি দিয়ে সাজানো খুঁটির পাশ কাটিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে থাকেন। শেষ খুঁটিটায় পৌছানোর আগে দু'খুঁটির পাশ

মাঝখান দিয়ে বল পাস্ করে দেন অপেক্ষমান সহযোগীর কাছে, সহযোগী আবার ছুটন্ত খেলোয়াড়ের দিকে সেটা পাল্টা পাস্ করে দেন সোজা গোলে মারবার জন্যে।

(৭) একজন খেলোয়াড় জমির ওপর দিয়ে বল পাস্ করে দেন একজন সহযোগীর কাছে যিনি বলটাকে গোলে মেরে দেন।

(৮) একজন খেলোয়াড় গোল-লাইন বরাবর বল নিয়ে ছুটে যেতে যেতে সেটা সহযোগীর দিকে পাস্ করে দেন, সহযোগী গোলের দিকে শুট্ করেন।

(৯) গোল থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে একজন খেলোয়াড় দ্রুতবেগে কোনাকুনি কিক্ করে বল পাঠান সহযোগীর কাছে, সহযোগী বলটিকে মাঝপথে ধরে গোলে শুট্ করে দেন।

(১০) সেণ্টার-বৃত্তের বাইরে দাঁড়ান দু'জন খেলোয়াড় আর সেণ্টারে দাঁড়ান একজন। প্রথম দু'জন খেলোয়াড় পরস্পরের মধ্যে বল পাস্ করেন বৃত্তের ভেতর দিয়ে—তাঁদের লক্ষ্য থাকে যাতে সেণ্টারের মধ্যে দাঁড়ানো খেলোয়াড়টি মাঝপথে বল আটকাতে না পারেন (কিকের সংখ্যা ও বল পাস্ করার পদ্ধতির রকমফের হতে পারে)।

(১১) বিপক্ষ খেলোয়াডদের পাশ কাটিয়ে ঘুরে দৌড়াতে দৌড়াতে দু'-দু'জন কি তিন-তিনজনের মধ্যে পাস্ করে খেলা।

(১২) ডান কি বাঁ ধার থেকে কর্নার কিকের সময় আক্রমণকারী বল হেড্ করে গোলে পাঠাবেন (কোনো রকম বাধা থাকবে না)।

(১৩) ঐ, বিপক্ষদলের বাধাদানের মধ্যে।

(১৪) কর্নার কিকের সময় রক্ষণদলের খেলোয়াড়রা হেড করে বল সরিয়ে দেবেন (বাধা থাকলে অথবা না থাকলে)।

(১৫) একজন খেলোয়াড টাচ-লাইন বরাবর বল নিয়ে ছোটেন ও সহযোগীর দিকে নিচু ক্রস্-পাসে বল পাঠান, সহযোগী সঙ্গে সঙ্গে গোলে শুট্ করেন।

আনুষঙ্গিক খেলা। (১) "বৃত্তমধ্যে বল" (অথবা "চতুষ্কোণে")। একটা বৃত্ত (অথবা চতুষ্কোণের) ধার দিয়ে খেলোয়াড়রা দাঁড়াবেন; তাঁরা নিজেদের মধ্যে বল পাস্ করতে থাকবেন আর বৃত্তটির (বা চতুষ্কোণটির) ভেতরে দাঁড়িয়ে আরেকদল খেলোয়াড় সে বল আটকাতে চেষ্টা করবেন। বল যদি বৃত্তের বাইরে চলে যায়, মাঝপথে আটকানো হয় অথবা প্রতিপক্ষের

কোনো খেলোয়াড় বল ছুঁয়ে ফেলেন, তাহলে শেষ দু'জন খেলোয়াড় যাঁরা বল ছুঁয়েছেন তাঁরা জায়গা বদল করবেন। নানা ধরনের পাস্ হতে পারে।

(২) ৩০ গজ × ৩০ গজ একটা চতুষ্কোণের মধ্যে বল রয়েছে। দু'পক্ষে দু'জন করে খেলোয়াড় খেলতে থাকবেন, একজন খেলোয়াড় থাকবেন নিরপেক্ষ; যাঁদের হাতে বল তাঁদের দিকেই তিনি ক্রমাগত যোগ দেবেন।

(৩) ঐ, তিনজনের বিরুদ্ধে তিনজন, চারজনের বিরুদ্ধে চারজন।

(৪) তিনজন থেকে ছ'জন খেলোয়াড় গোল আক্রমণ করবেন। আক্রমণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যতোক্ষণ না আক্রমণকারীদের কাছ থেকে বল হাতছাড়া হয়ে যায় অথবা গোল হয়। তারপর আবার শুরু করা হয় আক্রমণ। আরো বেশি খেলোয়াড, অথবা আগে থেকেই কিক্ বা পাস্ কী ধরনের হবে তা জানিয়ে দিয়ে খেলাটাকে জটিল করে তোলা যায়।

(৫) ঐ খেলাই আবার রক্ষণভাগের খেলোয়াডদের নিয়েও খেলতে পারা যায়।

(৬) একেকজনের বিপক্ষে একেকজন পাল্টা প্রতিপক্ষ নিয়েই বাস্কেট বল খেলা।

(৭) ঐ, হাত দিয়ে বল খেলা।

৮) ঐ, হকি।

প্র্যাক্টিস খেলা শেখা হয় ফুটবলের সাধারণ কায়দা-কৌশল বা ট্যাক্টিক্স আয়ত্ত করার জন্য,—সমবেত তৎপরতা, বিভিন্ন সারির খেলার কৌশল, বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের খেলার কৌশল, নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কৌশল, বিশেষ কোনো প্রথায় ক্রীড়ারত বিভিন্ন খেলোয়াড় ও সারির মধ্যে সমন্বয়, খেলার মাঝখানেই কৌশল পরিবর্তন করা বা আচম্কা কোনো কৌশল গ্রহণ করার ক্ষমতা—ইত্যাদি শেখার জন্য প্র্যাকটিস খেলা।

একটি নির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক খেলা চালানো হয়ে থাকে।

ফুটবল খেলোয়াড়দের কোচিং ও ট্রেনিং নির্ভর করে একটানা কাজের ধারার ওপর। এতে সারা বছরের জন্য অনুশীলনীর বন্দোবস্ত থাকে।

খেলোয়াড়দের সর্বাঙ্গীন শারীরিক, কায়দাকরণসংক্রান্ত, কলা-কৌশলসংক্রান্ত ও নৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা থাকে।

এই লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য নানা বিচিত্র পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

দ্রুততা, সহনক্ষমতা, শক্তি, তৎপরতা ও মানসিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হয়, অবশ্য আসল জোরটা পড়ে ফুটবলের কৌশলগত ও কায়দাকরণগত দিকটার ওপরেই।

খেলোয়াড়দের দক্ষতা বাড়াবার জন্য মরশুমের মধ্যে যতো দীর্ঘকাল ধরে প্রতিযোগিতামূল খেলার ব্যবস্থা করা যায় ততোই ভালো। সারা শীতকাল আউটডোর খেলা উচিত। তবে প্রতিযোগিতার খেলাগুলো যেন কখনোই নিয়মিত ট্রেনিং-এর ব্যাঘাত না ঘটায়।

নিয়মিত সারা-বছরব্যাপী অনুশীলনের ওপর যেন কোনক্রমে জোর করে অন্য ট্রেনিং চালানো না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এতে স্থায়ী ফল লাভ তো হয়ই না বরং স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ট্রেনিং-এর জন্য সময়ের অভাব থাকলে হঠাৎ-হঠাৎ শক্ত অনুশীলনী চর্চা করেও সে অভাবের পরিপূরণ হয় না। কারণ এতে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। খেলায় কোনো স্থায়ী উন্নতি ঘটে না। সারা বছরেই ট্রেনিং-এর সঙ্গে সঙ্গে যথোচিতভাবে বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে।

সুশৃঙ্খল ট্রেনিং-এর দ্বারা দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে ও সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের মান উন্নত হয়। এর ফলে গুরুতর শ্রম করার ক্ষমতা বাড়ে। একটানা ট্রেনিং ও শারীরিক সক্রিয়তার ফলে অনুশীলনীর সময় কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়।

ঠিকমতো ব্যায়াম বা খেলা বেছে নিয়ে অনুশীলনী চর্চাকে কঠিনতর করে তোলা যায়, আরো জটিল ও কষ্টকর অবস্থায় কাজ করা যায়। যারা প্রথম ট্রেনিং শুরু করেছে তাদের সপ্তাহে দু'তিন বার চর্চা করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে দক্ষতা ও শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনীর চর্চার সংখ্যা বাড়িয়ে সপ্তাহে তিনটে কি চারটে করা যেতে পারে। শিক্ষানবীশদের জন্য অনুশীলনীর গড় সময়কাল হওয়া উচিত দেড় থেকে দু'ঘণ্টা, ও পরে তা আড়াই ঘণ্টা অবধি হতে পারে।

খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষাদাতা অনুশীলনীর পরিমাণ বাড়াবেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রমান্বয়ে সাধারণ

ট্রেনিং-এর ভেতর দিয়ে তাদের উন্নতি হবে সারা বছর ধরে মূল কলা-কৌশলগুলো শিখতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। ট্রেনিং তদারক করবার সময় শিক্ষাদাতাকে—

১। দেখতে হবে যাতে অনুশীলনীগুলো ঠিকমতো শেখা হয় ও ভুলভ্রান্তি না থাকে।

২। যাতে অন্যান্য খেলোয়াড়দের কলাকৌশলগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করা না হয়। প্রত্যেক খেলোয়াড় যাতে তাঁর নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী ফুটবল আয়ত্ত করে সেইটাই তাঁদের বোঝাতে হবে।

৩। অনুশীলনীগুলোকে ক্রমান্বয়ে জটিল করে তুলতে হবে ও প্রায় সত্যিকারের খেলার পর্যায়ে এনে ফেলতে হবে।

৪। একটা অখণ্ড একটানা শিক্ষাধারার মধ্যে মূলগত পদ্ধতি ও কায়দা-কৌশল সংযুক্ত করতে হবে। কলাকৌশলগত নিপুণতাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার জন্য প্রতিযোগিতার পরিবর্তনশীল ও জটিল অবস্থার মধ্যে তা অধ্যয়ন করতে হবে।

৫। খেলোয়াড়দের শেখাতে হবে যাতে তাঁরা খেলার মধ্যে উদ্ভূত কৌশলগত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া, সময়ানুবর্তিতা ও আত্মসংযম বাড়াতে পারেন। প্র্যাকটিস খেলার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত যাতে বাস্তব কৌশলগত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়।

খেলা বা অনুশীলনীর শেষে খেলোয়াড়দের দোষত্রুটি যাচাই করতে হবে ও খেলার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব আচরণ বিশ্লেষণ করতে শেখাতে হবে।

ট্রেনিং-সূচীর শুরুতেই খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে খেলার ব্যাপারে নিপুণতা অর্জন করতে শুরু করতে হবে।

প্রত্যেক অনুশীলনী চর্চার শুরুতেই একবার শরীরের শ্লথকরণের (গা ঝেড়ে নেবার) ব্যায়াম করে নিতে হবে।

এতে অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাস পাবে ও খেলার জন্য শরীর-যন্ত্রগুলো তৈরি থাকবে। গা ঝেড়ে নেবার দু'টি ব্যায়াম সাধারণত ফুটবল খেলোয়াড়রা করে থাকেন।

প্রথম পদ্ধতি বল-প্র্যাকটিসের আগে। সেটা মুটামুটি এই ধরনের :

১। ধীরে ধীরে হাঁটা ও দৌড়ানো (৩৫০ থেকে ১০০০ গজ অবধি)।

২। সাধারণ উন্নতির পথে।

৩। সবেগে স্বল্প দূরত্বের দৌড়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় প্র্যাকটিস খেলা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলার আগে। এতে থাকে :

১। মাঠে আসার আগে ব্যায়ামাগারে কয়েকটি সাধারণ ব্যায়াম (পাঁচ ছ'টি ব্যায়াম করা)।

২। বল নিয়ে ইচ্ছামতো ফিল্ড অনুশীলনী (ফরোয়ার্ডরা গোলে মারা অভ্যাস করবেন ; ব্যাকরা কিক্ করা ও বল থামানো, হাফব্যাকরা পাস্ করা ও বল থামানো, গোলকীপাররা বল ধরা ও বলে ঘুষি মারা অভ্যাস করবেন। [দশ থেকে পনের মিনিট]।

সাধারণ ব্যায়ামের মধ্যে শরীর টান-টান করা এবং সেইসঙ্গে পালাক্রমে শরীর শিথিল করার ব্যায়াম চালাতে হবে ; এই ব্যায়ামগুলো দ্বারাই শরীর কঠিন পরিশ্রমের জন্য তৈরি হবে।

গা ঝাড়ার (শিথিল করার) ব্যায়ামের মধ্যে পড়ে সত্যিকারের খেলার কলাকৌশল (টেকনিক,) প্রধানত বল প্র্যাকটিস ও স্বল্প দূরত্বের দৌড়।

জখম এড়াবার জন্যও শ্লথ-করণ ব্যায়ামের বিশেষ মূল্য আছে। (মচকানো ও পেশী স্নায়ুগ্রন্থির স্থানচ্যুতির ব্যাপারে), বিশেষ করে শীত ও বর্ষার দিনে।

সফল ট্রেনিং-এর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হল যথাযথ রুটিন। অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে তা মেনে চলতে হবে। রুটিনের মধ্যে পড়ে সাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপার (ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদি) ও ট্রেনিং।

ট্রেনিং-এর প্রধান পর্যায়ে অনুশীলনীর সময় নির্ধারণ একটা মস্ত বড়ো ব্যাপার। ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবার কালে দিনের মধ্যে এমন একটা সময় বেছে নিতে হবে যে-সময়টা প্রতিযোগিতামূলক খেলার পক্ষে প্রশস্ত।

ট্রেনিং রুটিনের মধ্যে পড়ে নিয়মমাফিক অনুশীলনী, ভোরের ব্যায়াম ও প্রকৃতিজ প্রভাবক বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার (যেমন রোদ, হাওয়া, জল) সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক ও শিক্ষাদাতার তত্ত্বাবধান।

ধূমপান ও মদ্যপান একেবারে নিষেধ।

নিয়মিত রুটিন বিশেষ করে মেনে চলতে হবে প্র্যাকটিস ও প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার আগের দিনগুলোতে। খেলার দু'দিন আগে হাল্কা অনুশীলনী চর্চার প্রয়োজন। খেলার ঠিক আগের দিনটিতে হালকা ব্যায়াম ও বিশ্রাম চাই।

ঘুম, খাওয়া ও শরীর মর্দন ইত্যাদি সাধারণ নিয়মিত রুটিন খেলার দিনেও বহাল থাকবে। খেলোয়াড়রা সেদিন লম্বা হাঁটা, প্রতিযোগিতা, নতুন কোনো শ্লথ-করণের ব্যায়ামের মধ্যে একেবারেই যাবেন না।

ফুটবল ট্রেনিং সারাবছরব্যাপী অনুশীলনীর ওপর নির্ভর করে—এ অনুশীলনীকে বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও দুই খেলার মধ্যবর্তী অংশের মধ্যে ভাগ করা হয় থাকে।

খসড়া ট্রেনিং কর্মসূচী

[সারা বর্ষব্যাপী ট্রেনিং কর্মসূচীর ধারার মধ্যে ফুটবল খেলার পদ্ধতি ও কলাকৌশলগত শিক্ষার দিক ছাড়াও শারীরিক ব্যায়াম, ক্রীড়া, স্পোর্টস্ ও ফুটবলের কলাকৌশলের আনুষঙ্গিক অনুশীলনীগুলো আছে যার কিছু কিছু ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। স্বল্প পরিধির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা শুধু পদ্ধতি ও কলাকৌশল সংক্রান্ত শিক্ষা, প্র্যাকটিস্ ও ফুটবল চর্চার আনুষঙ্গিক ও সহায়ক খেলাগুলোর কথাই এখানে উল্লেখ করছি। ক্ষেত্র বিশেষে শুধু অনুশীলনীর উদ্দেশ্যটাই বলা হয়েছে। শিক্ষাদাতা তদনুযায়ী কর্মসূচী তৈরি করে নেবেন। বলা বাহুল্য ট্রেনিং-এর এই অপরিহার্য অঙ্গগুলোকে মূল হিসাবে রেখে শিক্ষাদাতা তাঁর নিজের ইচ্ছামতো অনুশীলনীর চর্চা নির্ধারণ করতে পারবেন—অঃ]

ট্রেনিং-এর প্রথম বছরে শিক্ষানবীশরা ফুটবলের মূল কলাকৌশল ও পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করবেন, স্বাস্থ্য গড়ে তুলবেন ও সামগ্রিকভাবে শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয় বছরে খেলোয়াড়রা সর্বাঙ্গীন শারীরিক বিকাশের অনুশীলনই চালিয়ে যাবেন।

ট্রেনিংকে মোটামুটি এই কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রস্তুতিমূলক পর্যায়—জানুয়ারী থেকে মে মাস অবধি।

এই পর্যায়ের আসল লক্ষ্য আগামী ফুলবল মরশুমের জন্য টিমকে তৈরী করা। খেলোয়াড়দের এ সময়ে খেলার পদ্ধতি ও কায়দাকৌশল শিখতে হবে। শক্তি, দ্রুততা, সহনক্ষমতা ও তৎপরতা বাড়াতে হবে। খেলোয়াড়-দের নৈতিক বল ও ইচ্ছাশক্তি গড়ে তোলার দিকেও শিক্ষাদাতা বিশেষ মনোযোগ দেবেন। খেলার পদ্ধতি ও কৌশলগত বিষয়ে খেলোয়াড়দের তত্ত্বগত জ্ঞান বাড়াতেও তিনি সাহায্য করবেন।

শীতকালের ট্রেনিং পরিকল্পনার একটা খসড়া অনুশীলনী-সূচী (বারো থেকে পনেরজন খেলোয়াড়ের উপযোগী) নিচে দেওয়া হল :

১নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য : সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

[কর্মসূচী শিক্ষাদাতার ব্যবস্থানুযায়ী]

২নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে বল কিক্ করতে শেখা। ডান পা, বাঁ পা।

(খ) বল ঠেলে নিয়ে যাওয়া : ডান পায়ে, বাঁ পায়ে, পালাক্রমে উভয় পায়ে।

(গ) বল আয়ত্তকরণ (কণ্ট্রোল) সহযোগে রীলে রেস্।

নির্দেশ : ১। শিক্ষাদাতা পায়ের পাতার ভেতর দিয়ে কিক্ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে অনেকবার তা প্রদর্শন করবেন—নজর রাখবেন যাতে খেলোয়াড়দের কিকের পা-খানি 'ফলো-থ্রু' করে ও দাঁড়ানো পায়ের ওপর দেহের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়।

২। শিক্ষাদাতা প্রথমে শেখাবেন কীভাবে বল নিয়ে দৌড়াতে হয়, তারপর এভাবে দৌড়ানোর সমস্ত পদ্ধতিগুলো প্রদর্শন করে দেখাবেন। খেলোয়াড়রা এক পায়ে প্র্যাকটিস শুরু করবেন এবং যে ভাবে দেখানো হয়েছে সেই ভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস করবেন।

৩নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য : সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

৪নং অনুশীলনী

১। বল নিয়ে ব্যায়াম :

(ক) বল ওপরে ছুঁড়ে দু'হাতে ধরা (৮-১০ বার)।

(খ) বল ওপরে ছুঁড়ে মেঝেতে বসে ধরা (৬ বার)।

(গ) পেছন দিক দিয়ে বল ওপরে ছোঁড়া ও ধরা (৬-৮ বার)।

(ঘ) মাথার পেছনে দিয়ে দু'হাতে বল ছুঁড়ে সহযোগীকে দেওয়া (৬-৮ বার)।

(ঙ) দু'হাতে বল ছুঁড়ে সহযোগীকে দেওয়া, সহযোগীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে (৬-৮ বার)।

(চ) দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সহযোগীকে বল দেওয়া, ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে (৪-৬ বার)।

(ছ) ডান পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে ও পরে বাঁ পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে বল ধরে রাখা (প্রত্যেক পায়ে তিন বার করে চেষ্টা করতে হবে)।

(জ) বল নিয়ে ছোটা—একবার ডান পায়ে, একবার বাঁ পায়ে (৪০-৫০ গজ)।

২। ঝুলন্ত বলে হেড করা। একপায়ে লাফ দিয়ে ও উভয় পায়ে।

নির্দেশ ঃ ১। শুধু হাতের পেশী ব্যবহার করে নয়, সমগ্র দেহকাণ্ডের সাহায্যেই বল ছুঁড়তে হবে।

২। হাত না লাগিয়ে শুধু পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে বল তুলতে হবে।

৩। হেড করার সময় মাথাটা পেছনে টেনে নিয়ে ফের সামনে এগিয়ে দিয়ে বল স্পর্শ করতে হবে।

৫নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার ভেতরের পাশ দিয়ে বল পাস্ করা ও পায়ের তলা দিয়ে বল পাকড়ানো।

(খ) বল নিয়ে রীলে দৌড়।

(গ) প্র্যাকটিস খেলা।

৬নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

৭নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার ভেতরের পাশ দিয়ে বল কিক্ করা।

(খ) পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক ও ভেতরের দিক দিয়ে কিক্ করা।

নির্দেশ ঃ ১। পায়ের পাতার ভেতর পাশ দিয়ে কিক্ করা অভ্যেস করার সবচেয়ে ভাল উপায় সার বেঁধে ছোটা অথবা বৃত্তাকারে দল বেঁধে দাঁড়ানো। দু'পায়েই কিক্ করতে হবে।

২। কিকের সময় পায়ের ডগা সামনে বাড়ানো চাই ও সেই পাটি ফলো থ্রু অবস্থায় থাকা চাই।

৮নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার পিঠের ভেতর দিয়ে কিক্ করা ও বল পাকড়াতে শেখা।

(খ) পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করতে শেখা।

(গ) প্র্যাকটিস খেলা।

৯নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

১০নং অনুশীলনী

দাঁড়িয়ে বল হেড করতে শেখা (৩০ মিঃ)

নির্দেশ ঃ বল হেড করার সময় শিক্ষাদাতা একটা বৃত্ত গড়ে নেন এবং কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের দিকে বল ছুঁড়ে দেন। পরে খেলোয়াড়রা দু'তিনটি দলে ভাগ হয়ে যান। কপাল দিয়ে হেড করতে হবে, মাথার পাশ দিয়েও হেড করতে শিখতে হবে।

১১নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের তলা দিয়ে বল পাকড়ানো ও বল থ্রো করতে শেখা।

(খ) পায়ের পাতার বাইরের দিক ও ভেতরের দিক দিয়ে বল পাকড়াতে শেখা।

(গ) পায়ের পাতার পিঠের ভেতরের দিক ও বাইরের দিক দিয়ে বল পাকড়াতে শেখা (পুনরাবৃত্তি)। গোলকীপার একহাতে বল থ্রো করা ও ডাইভ্ দিয়ে নিচু বলা ধরা শিখবেন।

(ঘ) প্র্যাকটিস খেলা।

১২নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

১৩নং অনুশীলনী

(ক) থ্রো-ইন প্র্যাকটিস করা।

(খ) লাফিয়ে বল হেড করতে শেখা।

(গ) পায়ের ভেতর পাশ ও বাইরের পাশ দিয়ে বল আটকাতে শেখা।

(ঘ) থ্রো-ইনের সঙ্গে বল পাকড়ানোর সংযুক্তি।

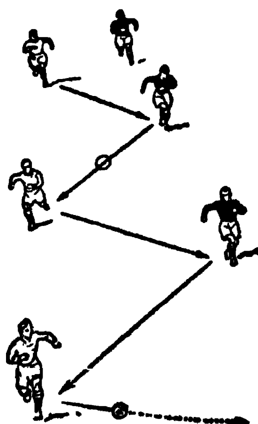
নির্দেশ ঃ ১। একেক পক্ষে দু'জন করে থ্রো করার অভ্যাস করবেন।

২। লাফিয়ে বল হেড করার আগে দাঁড়িয়ে হেড করার অভ্যাস করে নিতে হয়। শিক্ষাদাতা টিমকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিয়ে সঠিক মুহূর্তে লাফ দেওয়া হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করবেন। লাফের সর্বোচ্চ সীমায় উঠে বল স্পর্শ করা চাই।

৩। বল পাকড়ানো শেখবার সময় শিক্ষাদাতা প্রথমে বলটিকে খেলোয়াড়ের পায়ে ছুঁড়ে দেবেন, তারপর আরেকটু উঁচুতে এবং শেষে একবারে প্রায় খাড়াই ছুঁড়বেন।

১৪নং অনুশীলনী

(ক) দু'জন দু'জন করে দৌড়ানো অবস্থায় পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে বল পাস্ করবেন, অথচ নিজেদের অবস্থান বদলাবেন না। (ছবি ৬৩)



৬৩ নং চিত্র ॥ দু'জন দু'জন করে বল পাস্ করা

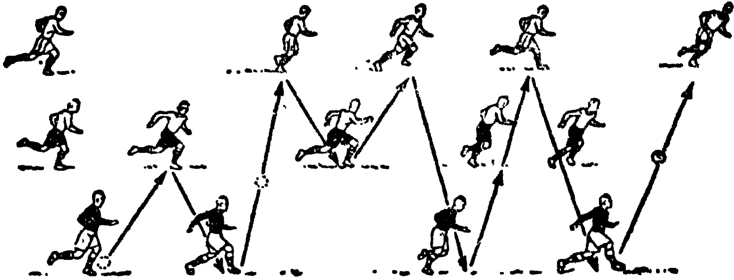
(খ) তিন-তিনজন করে দৌড়ানো অবস্থায় পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে বল পাস্ করবেন অথচ নিজেদের পারস্পরিক অবস্থান বদলাবেন না (ছবি ৬৪)।

(গ) ত্রিভুজাকারে দাঁড়িয়ে পায়ের পাতার ভেতর পাশ দিয়ে বল পাস্ করবেন। (ছবি ৬৫)।

(ঘ) আড়াআড়ি, কোনাকুনি ও সিধে বল পাস্ করতে শেখা।

(ঙ) প্র্যাকটিস খেলা।

নির্দেশ ঃ ১। যে ভাবে দেখানো হল এইভাবে খেলোয়াড়রা বল পাস্ করবেন। প্রায় দেড়শো দু'শো গজ দৌড়ে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

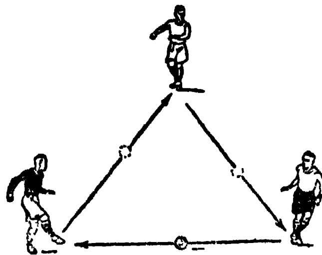


চিত্র ৬৪ ॥ তিন-তিনজনের মধ্যে পাস্ করা

তারপর জায়গা বদলাবদলি করবেন, অর্থাৎ প্রথমে একজন খেলোয়াড় ডান পায়ে কিক্ করবেন, তারপর বাঁ পায়ে, এমনিভাবে অদলবদল করে।

২। ত্রিভুজে পাস্ করার সময়ে প্রথমে একদিকে বল পাঠাবেন, তারপর উল্টো দিকে।

৩। পাস্গুলো বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রদর্শন করতে হবে, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেখাবার দরকার নেই।



চিত্র ৬৫ ॥ ত্রিভুজাকারে পাস্ করা

৪। গোলকীপারও অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগ দেবেন

১৫নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

১৬নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার ভেতর দিক ও বাইরের দিক দিয়ে বল পাকড়ানো।

(খ) থ্রো-ইন।

(গ) গোলকীপারের জন্য : ১। ঝাঁপ দিয়ে বল ধরা।
২। উঁচুর বল ধরা।
৩। কোমর বা বুক সমান উঁচু বল ধরা।

নির্দেশ ঃ ১। থ্রো-ইনের সময় খেলোয়াড়দের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমে বাড়িয়ে তুলতে হবে।

২। পালা করে পাস্ করতে হবে। খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে হবে।

১৭নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের ডগা দিয়ে কিক্ করতে শেখা।

(খ) নির্ভুল নিশানার জন্য পায়ের পাতার পিঠের বাইরের দিক ও ভেতর দিক দিয়ে কিক্ করা।

(গ) দৌড়ানো অবস্থায় বল ধরা।

(ঘ) পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে ও পিঠের দিক দিয়ে নির্ভুল কিকের প্র্যাকটিস খেলা। পায়ের তলা দিয়ে বল আটকানো।

নির্দেশ ঃ ১। শিক্ষাদাতাকে দেখতে হবে যাতে সঠিক স্থানে বলের সঙ্গে পায়ের ডগার সংযোগ ঘটে। বল যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই শুধু কিক্ করতে হবে।

২। নির্ভুল নিশানায় কিক্ করা অভ্যেস করতে হলে দু'টো লাঠি দু'গজ তফাতে খাড়া করে বসাতে হবে। ১২ কি ১৫ গজ দূর থেকে একবার ডান-পায়ে, পরে বাঁ পায়ে কিক্ করতে শুরু করুন।

৩। গোলকীপার এক হাতে ও দুই হাতে বলে ঘুষি মারতে শিখবেন, একহাতে বল থ্রো করবেন।

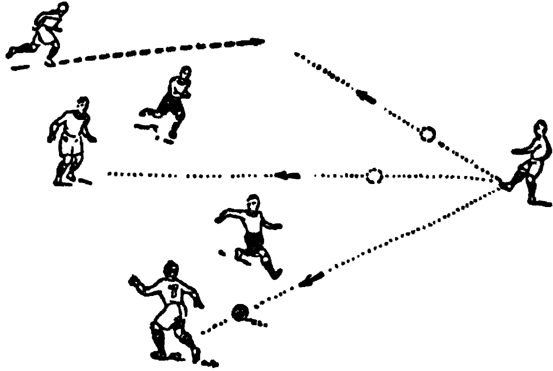
১৮নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

১৯নং অনুশীলনী

(ক) খোলা জায়গা বেছে নিয়ে পাসের বল ধরতে শেখা।

(খ) "চতুষ্কোণের মধ্যে" খেলা। প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যাওয়া অভ্যেস করতে হবে। (ছবি ৬৬)



চিত্র ৬৬ ॥ "চতুষ্কোণের মধ্যে" খেলা

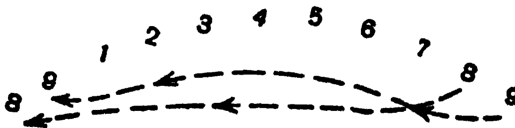
নির্দেশঃ ১। শিক্ষাদাতা খোলা জায়গা বেছে নেবার পদ্ধতি দেখিয়ে দেবেন।

২। "চতুষ্কোণের মধ্যে" খেলার ২০ × ৩০ গজের একটা চতুষ্কোণ এঁকে নিতে হয়। চতুষ্কোণের মধ্যে দু'জনের প্রতিপক্ষ হিসাবে থাকেন তিনজন অথবা চারজন খেলোয়াড়।

৩। টিমের আর সকলের সঙ্গে গোলকীপারকেও খেলতে হবে।

২০নং অনুশীলনী

(ক) এক সারিতে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো ও ৫০০-৬০০ গজ দৌড়। প্রত্যেকবারই সারির শেষ লোকটি ছুটে সারির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন (ছবি ৬৭)।



চিত্র ৬৭ ॥ সারির শেষ ব্যক্তি সামনে ছুটে যাচ্ছেন

(খ) পায়ের ডগা দিয়ে কিক্ করা: মাটির বল ও মাটি থেকে ২-৩ গজ উঁচুতে ওঠা বল।

গ) বক্ররেখা ধরে বল নিয়ে দৌড়ানো।

(ঘ) পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করা।

(ঙ) গোলকীপারকে : ১। হাত দিয়ে বল কণ্ট্রোল।

২। উঁচু ও নিচু বল ঠেকানো।

৩। নিচু বল ডাইভ্ দিয়ে ধরা শিখতে হবে।

নির্দেশ : ১। সারির সামনে ছুটে যেতে হবে হুইস্‌লের আওয়াজ শুনে ও লাইনের ভেতর দিক দিয়ে।

২। প্রথমে খেলোয়াড স্থির বলে পায়ের পাতার পিঠ দিয়ে কিক্ করা অভ্যাস করবেন, তারপর ছুটে আসা বলে। পায়ের পাতার পিঠের উপর কিক্ করা, পিঠের ভেতর দিয়ে ও বাইরের দিক দিয়ে কিক্ করার মধ্যে প্রভেদ কোন্ জায়গায় তা শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন ও কিক্ করে দেখাবেন। খেলোয়াড় পায়ের ডগা টান করবেন। খুব জোরে বলে কিক্ করবেন না।

৩। নির্ভুল কিক্ অভ্যাস করতে হলে খেলোয়াড়রা পাতলা তক্তার ওপর (একবর্গ গজ) অথবা লাঠির সঙ্গে বাঁধা চাকার বেড়ের মধ্যে নিশানা করবেন।

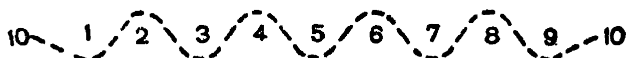
৪। একটা বৃত্ত আঁকুন (দশগজ ব্যাসের)। বৃত্তের বাইরের দিক দিয়ে খেলোয়াড়রা বল নিয়ে ড্রিব্‌ল্ করতে করতে ছুটবেন। প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পায়ে (প্রথমে এক দিকে, পরে অন্য দিকে)। বৃত্তের চারধারে ঘুরবার সময় বল-কণ্ট্রোল ভালোভাবে করতে হলে খেলোয়াড়দের ইচ্ছামতো নড়াচড়া করার স্বাধীনতা দেওয়া চাই।

২১নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য : সাধারণ শারীরিক উন্নতি।

২২নং অনুশীলনী

(ক) সারি বেঁধে দাঁড়ানো ও ৩০০-৪০০ গজ দ্রুত হাঁটা ; ৫০০-৬০০ গজ



চিত্র ৬৮॥ সারির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছোটা

দৌড়। সারির শেষ খেলোয়াড়রা সারির অন্য খেলোয়াড়দের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে পালা করে দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। (ছবি ৬৮)।

(খ) বুক ও মাথা দিয়ে বল ঠেকানো।

(গ) পায়ের পাতার ভেতর দিক দিয়ে বল পাস্ করা।

(ঘ) এতদিন যে সমস্ত কলাকৌশলগুলো শেখা হয়েছে তা প্র্যাকটিস করার জন্য খেলা। বল কখনো উঁচুতে উঠবে না।

নির্দেশঃ খেলায় সময় ক্রস্ পাস্ (আড়াআড়ি) ও কোনাকুনি পাস্ প্র্যাকটিস করুন। দেখুন যাতে প্রত্যেকটা চাল নিখুঁত হয়।

২৩নং অনুশীলনী

ফুটবল মাঠে খেলা প্র্যাকটিস ১ ঘণ্টা।

২৪নং অনুশীলনী

১৮ নং অনুশীলনীর পুনরাবৃত্তি।

২৫নং অনুশীলনী

(ক) দৌড়ানো অবস্থায় বল কণ্ট্রোল।

(খ) দূর থেকে থ্রো করা, ২ গজ ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে।

(গ) ৩০×৪০ গজ চতুষ্কোণের মধ্যে বিপক্ষের সঙ্গে প্র্যাকটিস খেলা।

(ঘ) হ্যাণ্ডবল খেলা। গোলকীপার বল কণ্ট্রোল শিখবেন হাত ও ড্রপ-কিকের সাহায্যে।

নির্দেশঃ ১। বৃত্তের মধ্যে থ্রো করার দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ানো। প্রত্যেকবারে ১ গজ করে।

২। চতুষ্কোণের মধ্যে খেলোয়াড়রা ইচ্ছামতো বল খেলবেন ও খোলা জায়গা বেছে নেবার চেষ্টা করবেন।

২৬নং অনুশীলনী

(ক) থ্রো-ইনের চাল শেখা।

১। সবচেয়ে নিকটবর্তী খেলোয়াড়ের কাছে বল থ্রো করা ও ফিরে নেওয়া।

২। টাচ-লাইন বরাবর বল নিয়ে ছোটা ও পেছন দিকে পাস্ করা।

(খ) জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ানো অবস্থায় ক্রস্ ও কোনাকুনি পাস্ ও গোলে বল মারা।

নির্দেশঃ ১। থ্রো-ইন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা ও পেছন দিকে পাস্ নির্ভুল হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করা।

২। টাচ-লাইন ধরে ছুটবার সময় খেলোয়াড় নির্ভুলভাবে পেছন দিকে 'থ্রো'-কারীর দিকে পাস্ করে দেবেন. থ্রো-কারীর এগিয়ে যাওয়াও খুব সময়মতো হওয়া চাই।

২৭ নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার পিঠের সাহায্যে কিক্ করা।

(খ) পায়ের তলা দিয়ে বল ধরা।

(গ) হেড করা।

নির্দেশঃ ১। একটা নিশানা লক্ষ্য করে কিক্ অভ্যাস করুন।

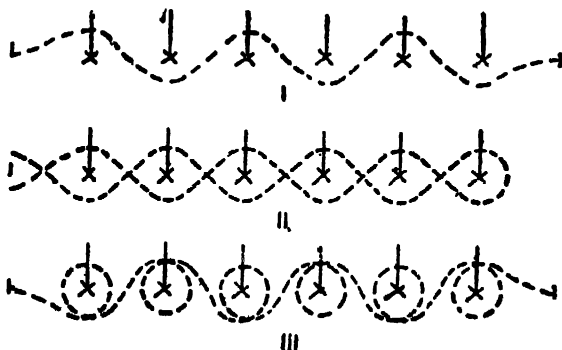
২। আল্গা পায়ে বল ধরবেন।

৩। দাঁড়ানো ও লাফানো অবস্থায় হেড করুন।

২৮নং অনুশীলনী

(ক) ১৮ গজ ব্যাসের একটা বৃত্তকে ঘিরে ও সরল রেখায় বল খেলা।

(খ) খুঁটির ধার দিয়ে ঘুরে দৌড়ানোর নানা পদ্ধতি (ছবি ৬৯)।



চিত্র ৬৯ ॥ দৌড়ানোর নানা পদ্ধতি

(গ) পায়ের পাতার ভেতর পাশ দিয়ে কিক্ করা।

(ঘ) হেড-ভলিবল।

নির্দেশঃ জোড়া বেঁধে অথবা বৃত্ত গড়ে ব্যাক ও হাফব্যাকের পায়ের পাতার ভেতর দিয়ে কিক্ অভ্যাস করবেন।

২৯নং অনুশীলনী

(ক) বল লোফালুফি করা।

(খ) কাঁধের ওপর থেকে এক হাতে বল থ্রো করা।

(গ) পেছন দিকে পাস্ করে প্র্যাকটিস খেলা।

নির্দেশঃ ১। প্রথমে ডান হাত ও পরে বাঁ হাত দিয়ে যতোটা দূরে সম্ভব বল থ্রো করতে হবে।

২। প্র্যাকটিস খেলায় পেছন দিকে পাস্ করা হয় টিম-সহযোগীর দিকে, তিনি আবার বলটা সামনেই আরেকজন খেলোয়াড়কে পাস্ করে দেবেন।

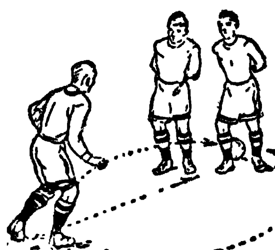
৩০ নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্যঃ সহন-ক্ষমতা বাড়ানো।

বিভিন্ন দূরত্বে ও গতিবেগে মোট দু'মাইল দৌড়ানো।

৩১নং অনুশীলনী

(ক) "বল ধরা" (গেট্ দি বল) খেলা (ছবি ৭০)।



চিত্র ৭০ "বল ধরা" খেলা

(খ) পায়ের পাতার পিঠের ভেতর ও বাইরের দিক দিয়ে কিক্ প্র্যাকটিস করা।

(গ) পায়ের পাতার ভেতর দিয়ে কিক্ করা।

(ঘ) পায়ের পাতার পিঠের ওপর দিয়ে কিক্ করা।

(ঙ) ৪০ × ৫০ গজ মাঠে খেলা অভ্যাস করা।

নির্দেশঃ ১। "বল ধরা" খেলার জন্য টিমকে তিনজনের একেকটা দলে ভাগ করে দেওয়া। একজন খেলোয়াড় শরীর ঘুরিয়ে ধরতে চেষ্টা

করেন, অন্য দু'জন শরীর দিয়ে বল আড়াল করে তাঁকে ঠেকাতে চেষ্টা করেন।

২। প্র্যাকটিস খেলায় পেছন দিকে পাস্ ও তৎপরতা বাড়াবার জন্য চাতুরীপূর্ণ পায়ের কাজ শিখবেন।

৩২নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাতার পাতার পিঠ দিয়ে বল পাকড়ানো।

(খ) বুক দিয়ে বল ঠেকানো।

(গ) লাফিয়ে গোলের দিকে বল হেড করা।

(ঘ) পায়ের ডগা দিয়ে নিশানায় কিক্ করা। গোলকীপার কাঁধের ওপর দিয়ে বল থ্রো অভ্যাস করবেন, ও সোজা মাঠের ওপর দিয়ে কিক করবেন।

৩৩নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সহন-ক্ষমতা বাড়ানো।

৩৪নং অনুশীলনী

(ক) পায়ের পাশ দিয়ে বল আটকানো।

(খ) বুক দিয়ে বল ঠেকানো।

(গ) দূরত্ব ও নিশানার নির্ভুলতার জন্য থ্রো করা।

(ঘ) বাঁকা, সোজা ও আঁকাবাঁকা লাইনে বল কণ্ট্রোল অনুশীলন করা। গোলকীপার ডাইভ দিয়ে কর্নারের দিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া নিচু বল ও উঁচু বল ধরবেন।

(ঙ) বল অনুশীলন।

৩৫নং অনুশীলনী

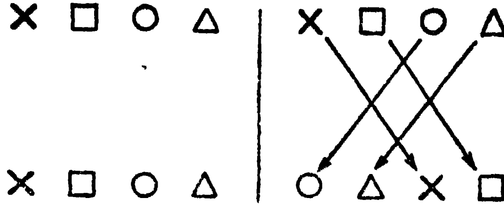
(ক) "জুটি খুঁজে বের করা ও তাকে বল পাস্ করার" খেলা। (৭১ নং ছবি)।

(খ) জোড়ায় জোড়ায় অথবা তিনজন করে রানিং পাস্ করে গোলে বল ছোঁড়া।

(গ) আগে শেখা সমস্ত রকম পাস্ ব্যবহার করে প্র্যাকটিস খেলা।

নির্দেশ ঃ ১। "জুটি খোঁজার" খেলায় (৭১ নং ছবি) দলকে দু'লাইনে ভাগ করে দিন। শিক্ষকের দিকে মুখ করে তিন গজ তফাতে

প্রথম লাইনের খেলোয়াড়রা দাঁড়াবেন; দ্বিতীয় লাইন দাঁড়াবেন প্রথম লাইনের ঠিক পিছনেই। ইশারা করা মাত্র দ্বিতীয় লাইনের খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে জায়গা বদলাবদলি করবেন; দ্বিতীয়বার ইশারা করতেই



চিত্র ৭১ ॥ "জুটি খোঁজার" খেলার নক্শা

প্রথম লাইনের খেলোয়াড়রা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় লাইনের মধ্যে তাঁদের জুটিদের খুঁজে বের করবেন ও তাঁর দিকে বল পাস্ করে দেবেন।

২। খুঁটির সারির ভেতর দিয়ে দৌড়ানোর সময় দু'জন খেলোয়াড় নিজেদের মধ্যে বল পাস্ করবেন; তিনজন খেলোয়াড় দৌড়ানো অবস্থায় বল পাস্ করবেন; গোলের দিকে দুটো দলই শুট্ করে খেলা শেষ করবেন।

৩৬নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য ঃ সহনক্ষমতা বাড়ানো।

এ পর্যায়ে মূল কলাকৌশল ও কায়দাকরণের অনুশীলনী ক্রমেই বাড়িয়ে তুলতে হবে।

যে সব খেলোয়াড়ের স্বাস্থ্য উন্নত ধরনের ও যাঁরা খেলায় সক্রিয় কর্মক্ষমতার উচ্চ মান বজায় রাখতে পারছেন এমনি ধরনের খেলোয়াড়দের জন্য আরেকটু জটিল প্রকৃতির কতকগুলো আদর্শ অনুশীলনী আমরা এখানে দিচ্ছি।

আদর্শ অনুশীলনী

১ নং

শীতের সময়ের জন্য।

১। বল থামানোর কায়দা রপ্ত করা।

২। অবস্থান বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে পাস্ করতে শেখা।

৩। সহনক্ষমতা বাড়ানো।

(ক) থ্রো-ইন ও বল থামানোর পরেই গোলে বল মারা।

(খ) অবস্থান বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে দু দু'জন কি তিন তিনজনের মধ্যে পাস্ করা।

(গ) "চতুষ্কোণের" মধ্যে খেলা. তিনজনের বিপক্ষে একজন।

নির্দেশঃ ১। শুধু আলাদাভাবে মুভ্‌মেণ্ট শিখলেই হবে না, তাড়াতাড়ি নির্ভুল সমবেত তৎপরতাও শিখতে হবে। একজন খেলোয়াড় ১৫-২০ গজ দূরে সহযোগীর কাছে বল ছুঁড়ে দেওয়ার পর তিনি বল থামিয়ে চট্ করে গোলে শুট্ করেন। খেলোয়াড়রা যাতে দ্রুত চলাচল করেন শিক্ষাদাতা সেটা দেখবেন।

২। অবস্থান অদলবদল করার ভেতর দিয়ে দু'দুজনের বা তিন তিনজনের পাস্ আরো জটিল করে তোলা হয়। তাই এতে খেলোয়াড়দের দমের প্রয়োজন হয়। খেলোয়াড়রা চূড়ান্ত দ্রুততা বাড়াবার চেষ্টা করবেন।

২নং অনুশীলনী

শীতকালে।

উদ্দেশ্য : (ক) মাথা টপকানো ও স্লাইসড্ কিক্ রপ্ত করা।

(খ) সত্যিকারের খেলার মধ্যে হেড করতে শেখা।

১। মাথা-টপকানো কিক্ (২০ মিঃ)।

২। "ট্যারচা" কিক্ (২০ মিঃ)।

৩। প্রতিপক্ষের বাধার মধ্যে হেড্ করা (১৫ মিঃ)।

৪। চতুষ্কোণের মধ্যে "ট্যারচা" কিক্ অভ্যাস করা।

নির্দেশঃ ১। পা খুব উঁচুতে না তুলে মাথা-টপকানো কিক্ অভ্যাস করুন। ক্রমে ক্রমে পা কাঁধের সমান উঁচুতে ওঠান, পারলে আরো ওঠাতে চেষ্টা করুন। মাথা-টপকানো কিক্ করে গোলে বল মারতে চেষ্টা করুন। (পেছন দিকে চিতিয়ে পড়ার ভঙ্গিসহ)। দু' পায়েই এটা অভ্যাস করুন।

২। পায়ের পাতার পিঠের ভেতর ও বাইরের দিক দিয়ে 'ট্যারচা' কিক্ করুন। প্রথমে 'স্থির বলে' অভ্যাস করুন। পরে সামনে এগিয়ে আসা বা পাশের দিকে যাওয়া বলে।

৩। হেডিং অভ্যাস করার পর 'ট্যারচা' কিক্ অভ্যাস করুন—এবার চতুষ্কোণের মধ্যে খেলতে খেলতে।

৪। গোলরক্ষকরা বলে ঘুষি মারা ও নিচুর বল ধরতে চেষ্টা করবেন।

৩নং অনুশীলনী

শীতের পর—বসন্তকালে।

উদ্দেশ্য ঃ ১। পায়ের ডগা দিয়ে বল থামাতে চেষ্টা করা।
২। গোলে নির্ভুলভাবে শুট্ করতে চেষ্টা করা।
৩। সেণ্টার-ফরোয়ার্ড প্রান্তভাগে সরে গিয়ে খেলবেন।

(ক) পায়ের ডগা শিথিল করে বল পাকড়ানো।

(খ) সেণ্টার-ফরোয়ার্ডের কাছ থেকে বল পাওয়ার পর ইনসাইড্-ফরোয়ার্ডরা গোলে বল মারবেন।

(গ) সেণ্টার-ফরোয়ার্ড প্রান্তভাগের দিকে সরে যেতে যেতে খেলবেন।

(ঘ) গোলকীপার গোল থেকে বেরিয়ে এসে ডাইভ দেওয়া অভ্যাস করবেন।

নির্দেশ ঃ ১। বল পাকড়ানোর সহজ পদ্ধতিগুলো রপ্ত হবার পর তবেই পায়ের ডগা শিথিল করে বল পাকড়ানো অভ্যাস করা উচিত। অনুশীলনীর সময় হয় খেলোয়াড় নিজে অথবা তাঁর একজন সহযোগী বল ছুঁড়বেন।

২। গোলের দিকে বলে শুট্ করার সময় অনুশীলনী শুরু হবে ডান প্রান্ত ভাগ থেকে পাস্ করে। সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বল ধরে ফের ইনসাইড-ফরোয়ার্ডের কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি দৌড়ানো অবস্থায় তা গোলে শুট্ করবেন। বাঁ প্রান্তভাগ থেকেও একই অনুশীলনী চর্চা করবেন।

প্রথমে সেণ্টার ফরোয়ার্ড বল থামাবেন, তারপর পাস্ করে দেবেন। এই জিনিসটা আয়ত্ত হবার পর বল না থামিয়েই তিনি ইনসাইড-ফরোয়ার্ডকে পাস্ করে দেওয়া অভ্যাস করবেন। উইঙ্গারের পক্ষে নির্ভুলভাবে পাস্ করা অত্যন্ত জরুরী। এই অনুশীলনীটিকেই আরো কঠিন করা যায় এইভাবে : একজন বিপক্ষ খেলোয়াড় থাকবেন যিনি সেণ্টার-ফরোয়ার্ডকে পাহারা দেবেন ও ইনসাইড-ফরোয়ার্ডের দিকে বল পাস্ করার সময় তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করবেন।

৩। পাসিংও জটিলতর করা যায়। মাঠের সেণ্টার থেকে ফরোয়ার্ডরা স্টার্ট করে গোলের দিকে ছুটবেন ও ছোটা অবস্থাতেই ইচ্ছামতো বল পাস্ করবেন। সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বাঁ অথবা ডান উইংয়ের দিকে সরে যাবেন আর তাঁর জায়গা নেবেন যথাক্রমে তাঁর বিপরীতের উইঙ্গাররা। অনুশীলনী

প্রতিবারই সেণ্টার থেকে শুরু হয়, কাজ হয় অত্যন্ত দ্রুত, কোনোরকম বাধা এতে থাকে না।

৪। গোল থেকে বেরিয়ে গোলরক্ষক বল-সহ কোনো প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া অভ্যেস করেন; সঠিক সময়ে তাঁকে বেরিয়ে আসা ও ডাইভ দেওয়া শিখতে হবে।

৪নং অনুশীলনী (ট্যাকটিক্স)

বসন্তকালে।

উদ্দেশ্য ঃ ১। অবস্থানের অদলবদল অভ্যাস করা।

২। গোলরক্ষক ও হাফব্যাকদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো।

৩। খেলার পদ্ধতি বদলে দেবার উদ্দেশ্যে হাফব্যাকদের লম্বা সিধে পাস্ করে খেলা।

(ক) ইনসাইড-ফরোয়ার্ডের সঙ্গে জায়গা বদল করেন উইঙ্গার, আবার ইনসাইড-ফরোয়ার্ড তাঁর বিপরীতের ইনসাইড খেলোয়াড়ের সঙ্গে জায়গা বদল করে খেলেন।

(খ) ব্যাকরা গোলরক্ষকের দিকে ব্যাক-পাসিং করা অভ্যেস করেন, গোলরক্ষক বল ছুঁড়ে দেন ব্যাক ও হাফব্যাকদের।

(গ) প্র্যাকটিস খেলা। আকস্মিক ক্রস্-ফিল্ড পাস্ অভ্যাস করুন, ব্যাকেরা শিখবেন কী ভাবে বল গোলরক্ষকের কাছেই ফের পাস্ করে দেওয়া যায়, গোলরক্ষক আবার টিমের একজন সহযোগীর কাছে বল থ্রো করে দেবেন।

নির্দেশ ঃ ১। ইনসাইড-ফরোয়ার্ডের সঙ্গে উইঙ্গারের জায়গা বদল করার নানা পদ্ধতি হতে পারে।

(ক) ডান উইঙ্গার টাচ-লাইন বরাবর বল পাস্ করে দেন খোলা জায়গায়, রাইট্-ইন ছুটে যান বলের দিকে; ইত্যবসরে ডান উইঙ্গার চলে যান ইনসাইড অবস্থানে।

(খ) ইনসাইড-ফরোয়ার্ড প্রথমে টাচ-লাইনের দিকে ছুটে যান, তারপর উইঙ্গারের নির্ভুল পাস্ ধরেন। বাম উইং-এ অথবা উইঙ্গার ও সেণ্টার ফরোয়ার্ডদের মধ্যেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২। গোলরক্ষকের দিকে বল ফিরে পাস্ করে দেবার সময় ব্যাককে

খেয়াল রাখতে হবে যাতে বল গোল থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়ে—নয়তো হঠাৎ তা নেটের মধ্যে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্র্যাকটিস খেলার সময় এই চালগুলো ব্যাপকভাবে অভ্যাস করতে হবে এবং গোলরক্ষক ও ব্যাকদের মধ্যে ভালো টিমওয়ার্কের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাদাতা সময় সময় ভুলত্রুটি ব্যাখ্যা করে দেবার জন্য খেলা থামাতে পারেন। গোলরক্ষককে ব্যাকের দিকে, হাফব্যাকের দিকে, এমন কি ফরোয়ার্ডদের দিকেও এক হাতে বল ছুঁড়ে দেওয়া অভ্যাস করতে হবে। যদি তিনি তা না পারেন তাহলে তাঁকে দু'হপ্তা সময় দিতে হবে শিখে নেবার জন্য।

খেলার সময় কিক্ অফ, ফ্রি কিক্, পরে ফ্রি কিক্ ও কর্নার কিকের চাল অভ্যাস করতে হবে।

৫নং অনুশীলনী (টেকনিক)

এপ্রিল-মে মাস।

উদ্দেশ্য ঃ ১। চাতুরীপূর্ণ চাল খেলা।

২। বুক দিয়ে বল ঠেকাতে শেখা।

৩। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে গেলে বল মারতে শেখা।

(ক) বলের সামনে পা রেখে চাতুরী করে পা তুলিয়ে নেওয়া।

(খ) বল নিয়ে ডান দিকে ছুটে যেতে যেতে বাঁ দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে নেওয়া।

(গ) বুক দিয়ে বল ঠেকিয়ে তা সহযোগীর দিকে পাস্ করে দেওয়া।

(ঘ) বল পাকড়াবার পর তা গোলে শুট্ করা ও প্রতিপক্ষের পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া।

(ঙ) খেলা ; চতুষ্কোণের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে দু'জন।

নির্দেশ ঃ ১। প্রথমে স্থির বলের সাহায্যে চাতুরীপূর্ণ খেলা অভ্যাস করুন। তারপর ছুটন্ত বল নিয়ে। প্রথম গোটা টিমই অভ্যাস করবেন, তারপর প্রত্যেকে আলাদাভাবে, প্রথমে ডান পায়ে, তারপর বাঁ পায়ে।

২। বুক দিয়ে বল ঠেকনোর সময় বল নির্ভুলভাবে ছোঁড়া চাই। বুক থেকে পায়ে ড্রপ খাওয়ানো শিখতে হবে খেলোয়াড়কে।

এই অনুশীলনীই নানাভাবে করা যেতে পারে :

বুক দিয়ে বল ঠেকিয়ে পা দিয়ে তুলে বলটাকে পাস্ করে দিন। অথবা বলকে মাটিতে পড়তে দিন, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই পাস্ করে দিন।

৩। গোলে বল মারাও নানা কায়দায় জটিল করে তোলা যায়। এই অনুশীলনীতে আগে বল পা দিয়ে পাকড়াতে হবে, নিষ্ক্রিয় প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে বল গোলে শুট্ করতে হবে। যতো দ্রুত সম্ভব এটা করতে হবে। এই চালটির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে পারলে ভালো হয়—সময় নির্ধারণ করতে হবে বল পাকড়ানোর মুহূর্তটি থেকে বল যখন গোল-লাইন পার হল সেই মুহূর্তটি পর্যন্ত।

প্রথমে ডান পায়ে, পরে বাঁ পায়ে বল পাকড়ানো ও বল নিয়ে দৌড়ানো অভ্যেস করতে হবে।

৬নং অনুশীলনী (টেকনিক)

প্রাক্-প্রতিযোগিতা পর্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ ১। ট্রেনিং-এর সাজাসরঞ্জামের সাহায্যে টেকনিক আয়ত্ত করা।

২। গ্রুপ খেলার মাধ্যমে টেকনিক আয়ত্ত করা।

সরঞ্জাম : প্র্যাকটিস শুটিং শেখার জন্য বড়ো কাঠের তক্তা, ছোট আকারের গোল। ঝুলন্ত বলের জন্য স্ট্যাণ্ড, বল, হুইসল্।

(ক) তক্তার দেয়ালে বল কিক্ করা।
ছোট গোলে শুট্ করা।
ঝুলন্ত বলে হেড করা।
বালির পিঠে ডাইভ্ দিয়ে গোলরক্ষকেরা বল ধরা অভ্যাস করুন।

(খ) ট্যাক্লিং ক্রসপাস্ করে শুট্ করা।

নির্দেশ ঃ ১। ট্যাকলিং অভ্যাস করার সময় খেলোয়াড়রা বল পাকড়ানো, ট্যারচা মার, বিপক্ষকে ঠকানো, চাতুরীপূর্ণ চাল ইত্যাদি প্রয়োগ করবেন।

২। গোলে বল মারা প্র্যাকটিস করার সময় এমন খেলোয়াড়দের বাছাই করে নিতে হবে যাঁরা জোরে এবং নির্ভুলভাবে গোল লাইন বরাবর কিক্ করতে পারেন। যে খেলোয়াড় বল ধরবেন তিনি বলের রাস্তায় পা রাখবেন যাতে সেটা নেটের মধ্যে কিক্ করে ঢোকানো যায়। পরে উইঙ্গাররা পূর্ণবেগে বল নিয়ে গোল লাইনের দিকে ছুটে এসে গোল লাইনের ওপর দিয়ে বল পাস্ করে দেবেন।

৭নং অনুশীলনী (ট্যাকটিক্‌স)

প্রাক্‌-প্রতিযোগিতা পর্যায়।

উদ্দেশ্য ঃ বাস্তব খেলার মতোই বিভিন্ন চালগুলো রপ্ত করা।

(ক) কিক্‌-অফ্, থ্রো-ইন, পরোক্ষ ফ্রি কিক্ ও ফ্রি-কিক্ থেকে বিভিন্ন প্রকারের চাল অভ্যাস্ করা।

নির্দেশ ঃ খেলার সময় দলের ক্যাপটেন নিজেই কয়েকটি চাল বুঝিয়ে দিয়ে খেলোয়াড়দের চালাবেন। অনুশীলনীর সময় কঠোর শৃঙ্খলা থাকা চাই। টিম যে সময় সুসংবদ্ধ লড়িয়ে দল হিসাবে গড়ে উঠছে তখন এটা খুবই দরকারী।

৮নং অনুশীলনী

মে মাস।

উদ্দেশ্য ঃ ১। খেলোয়াড়দের শারীরিক উৎকর্ষের মান লক্ষ্য করা।
২। টেকনিকের পরীক্ষা।

(ক) গোলের একটা অংশে ($\frac{১}{৪}$ অংশের মধ্যে) শুট্ করা।

(খ) দৌড়ানো অবস্থায় বল কণ্ট্রোল (বৃত্তের পাশ দিয়ে অথবা যে-কোনো বিশেষ দিকে)।

(গ) থ্রো-ইনের দূরত্ব দেখা।

নির্দেশ ঃ গোল করা জটিলতর হতে পারে দূরত্ব বাড়িয়ে অথবা একেকবারে আক্রমণে সুযোগের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে।

৯নং অনুশীলনী

জুন মাস।

উদ্দেশ্য ঃ ১। আগের খেলার ভুলভ্রান্তি শোধরানো।
২। দ্রুততা বাড়ানো।

(ক) ১ নং গ্রুপ—গোলে শুট্ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বল পাকড়ানো
২ নং গ্রুপ—গোলে বল হেড করে দেবার জন্য লাফ দেওয়া।
৩ নং গ্রুপ—বুক দিয়ে বল ঠেকানো ও বল নিয়ে দৌড়ানো।

(খ) ১ নং গ্রুপ শুটিং প্র্যাকটিস করা।
২ নং গ্রুপ—পেনাল্টি কিক্ প্র্যাকটিস করা।

(গ) ১ নং গ্রুপ—কর্নার কিক্ অভ্যাস করা।
২ নং গ্রুপ—পেনাল্টি কিক্ অভ্যাস করা।
৩ নং গ্রুপ—উইং থেকে পাস্ অভ্যাস করা।
৪ নং গ্রুপ—পেনাল্টি গণ্ডিতে বল শুট্ করা।

(ঘ) প্র্যাকটিস খেলা।

১০নং অনুশীলনী (ট্যাকটিক্স)

জুন মাস।

উদ্দেশ্য : সংখ্যাধিক দলের সঙ্গে খেলতে শেখা।

নির্দেশ : ১। সাধারণ সমবেত মুভ্মেণ্ট, অবস্থানগত অদল বদল সমেত সমবেত মুভ্মেণ্ট ছাড়াও সংখ্যাগুরু দলের সঙ্গে খেলার কৌশল শেখা দরকার। খেলার সময় শিক্ষাদাতা একজন খেলোয়াড়কে বের করে নেবেন, এগারোজনের বিরুদ্ধে দশজনকে রেখে পুরো টিমটিকে হুকুম দেবেন যাতে নির্ভুল লম্বা কিক্ মেরে বিপক্ষকে তাঁরা হয়রান করেন।

২। (জখম ও অন্য কোনো কারণে) যদি কোনো খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে হয়, তাহলে রিজার্ভ খেলোয়াড়দের ভেতর থেকে একজনকে তাঁর স্থান গ্রহণ করতে হবে। নতুন খেলোয়াড়কে আগে বেছে ট্রেনিং দিয়ে রাখা ভালো।

১১নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য : শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখা।

১২নং অনুশীলনী

উদ্দেশ্য : ১। হেডিং আয়ত্ত করা।
২। থ্রো-ইনের চালের পুনরাবৃত্তি।
৩। হাফব্যাক ও উইঙ্গারদের মধ্যে টিম-ওয়ার্ক।

(ক) থ্রো-ইন চাল অভ্যাস করা।

(খ) উইং থেকে আসা বল মাঝপথে ঠেকানো, প্রতিপক্ষের বাধার মধ্যে গোলে শুট্ করা।

(গ) তিন-তিনজনের মধ্যে দৌড়ানো অবস্থায় বল পাস্ করা ও পেনাল্টি গণ্ডির বাইরে থেকে গোলে বল মারা। নির্ভুল কিকের জন্য ব্যাকেরা লম্বা নিচু শট্ মারবেন।

নির্দেশ : আগের চেয়ে উঁচুতে লাফ দিয়ে এখন বল হেড করতে হবে। এক সঙ্গে দু'পায়ে অথবা আলাদাভাবে প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পায়ে, লাফিয়ে হেড করুন।

থ্রো ইন চালগুলো অভ্যেস করবেন উইঙ্গাররা, ইনসাইড-ফরোয়ার্ডরা, হাফব্যাক ও ব্যাকরা (দু'দিকের উইংএই)। সেন্টার-ফরোয়ার্ড যে কোনো গ্রুপে প্রয়োজনমতো যোগ দিতে পারেন।

যে তিনজন বল পাস্ করা প্র্যাকটিস করবেন তাঁরা হলেন; রাইট আউট, রাইট ইন আর হাফব্যাক—পেছন দিকে পাস্ ধরে হাফব্যাক গোলে মারবেন। তিনি পেনাল্টি-গণ্ডি অবধি এগিয়েও আসতে পারেন। গোল-রক্ষকরা গোল পাহারা দেবেন।

১৩নং **অনুশীলনী** (টেকনিক)

প্রতিযোগিতার পরবর্তী পর্যায়।

উদ্দেশ্য : শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নত মান বজায় রাখা ও কলাকৌশল আয়ত্ত করা।

প্র্যাকটিস খেলা।

নির্দেশ : বুক ও উরু দিয়ে বল ঠেকানো, পা দিয়ে বল তোলা অভ্যাস করুন।

১৪নং **অনু**

উদ্দেশ্য : সাধারণ শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখা।

পরীক্ষামূলকভাবে এই অনুশীলনীগুলো চলতে পারে :

১। ডান অথবা বাঁ পায়ে স্থির বল শুট্ করা (উঁচু দিয়ে কিক্ করতে হবে)।

২। যতো দূরে সম্ভব স্থির বল কিক্ করা, পর পর দু'পায়ে।

৩। মাঠের সেন্টার থেকে ছ'টা খুঁটির ফাঁক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বল নিয়ে দৌড়ানো, খুঁটিগুলো সোজা চার গজ দূরে দূরে পুঁততে হবে। গোল থেকে প্রায় সতের গজ দূরে এসে বল কিক্ করতে হবে।

৪। কেন্দ্র-বৃত্তের চার দিক দিয়ে ড্রিবলিং করা।

৫। ঝুলন্ত বলে হেড করা।

৬। ঝুলন্ত বলে বাঁ অথবা ডান পায়ে কিক্ করা।

৭। পা অথবা মাথা দিয়ে বলটাকে যতোদূর সম্ভব শূন্যে রেখে দেওয়া।

বছরে বছরে ট্রেনিং-এর ধারায় শারীরিক তৎপরতার পরিমাণ বাড়াতে হবে। ট্রেনিং আরো কঠিন করে তুলতে হবে, ক্রমেই বেশি করে শক্ত প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের নামতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড় হবার কৌশল তাঁদের শিক্ষাদাতার তদারকীতে আরো বেশি ব্যক্তিগত ট্রেনিং নিতে হবে।

সাজ-সরঞ্জামের যত্ন

সঠিক ওজন, মাপ ও আকারের বল থাকা চাই। প্রত্যেক খেলার শেষে বলের বাতাস বের করে দিলে বল ভালো থাকে। পরিষ্কার করে মুছে রাখা চাই। বর্ষার আবহাওয়ায় খেলার আগে বলে গ্রিজ্ মাখাতে হয়। পাম্পটিতেও যেন ভালো করে গ্রিজ্ দেওয়া হয়।

বলের লেস শক্ত করে বাঁধতে হবে। অনুশীলনীর সময় জার্সির পেছনে খেলোয়াড়দের নম্বর লাগাতে হয়।

বুট, জার্সি, গোলরক্ষকের এলবো-গার্ড, নি-গার্ড প্যাড ইত্যাদি ভালো অবস্থায় রাখতে হবে। উন্নত ট্রেনিং ও জখমের ভয় এড়ানোর জন্য এগুলোর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

আন্তর্জাতিক খেলার নিয়মাবলী

**[ভারতীয় ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন (আই. এফ. এ)
দ্বারা সংবিধানগতভাবে স্বীকৃত]**

ভারতীয় ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে যে প্রতি-বৎসর ইংলণ্ডের 'ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন বোর্ড' খেলার যে সব নিয়ম-কানুন সাব্যস্ত করবেন সেগুলোই আই এফ. এর খেলায় সেই বৎসরের প্রয়োজ্য বলে মেনে নেওয়া হবে।

ফুটবলের এই সব নিয়মাবলীর দুটো প্রধান উদ্দেশ্য :—খেলার নিয়ন্ত্রণ এবং যাঁরা খেলেন তাঁদের স্বার্থসংরক্ষণ। নিয়ামাবলীগুলো শৌখিন ও পেশাদার খেলোয়াড়, সিনিয়র ও জুনিয়র ক্লাব, প্র্যাকটিস ও প্রতিযোগিতার খেলা · সর্বত্রই সমান প্রযোজ্য।

সবসুদ্ধ সতেরটি নিয়ম আছে। দীর্ঘ আশি বছরের অভিজ্ঞতার উপর ধীরে ধীরে এই নিয়মগুলো গড়ে উঠেছে। —প্রকাশক

দ্রষ্টব্য : এই নিয়মাবলীর মূল নীতিগুলোকে বজায় রেখে স্কুল-বয়েসের খেলোয়াড়দের জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে, যেমন (ক) খেলার জমির আয়তন, (খ) বলের আকার ও ওজন, (গ) দুই গোল-পোস্টের দূরত্ব ও মাটি থেকে ক্রস্‌বারের উচ্চতা, (ঘ) খেলার সময়ের মেয়াদ।

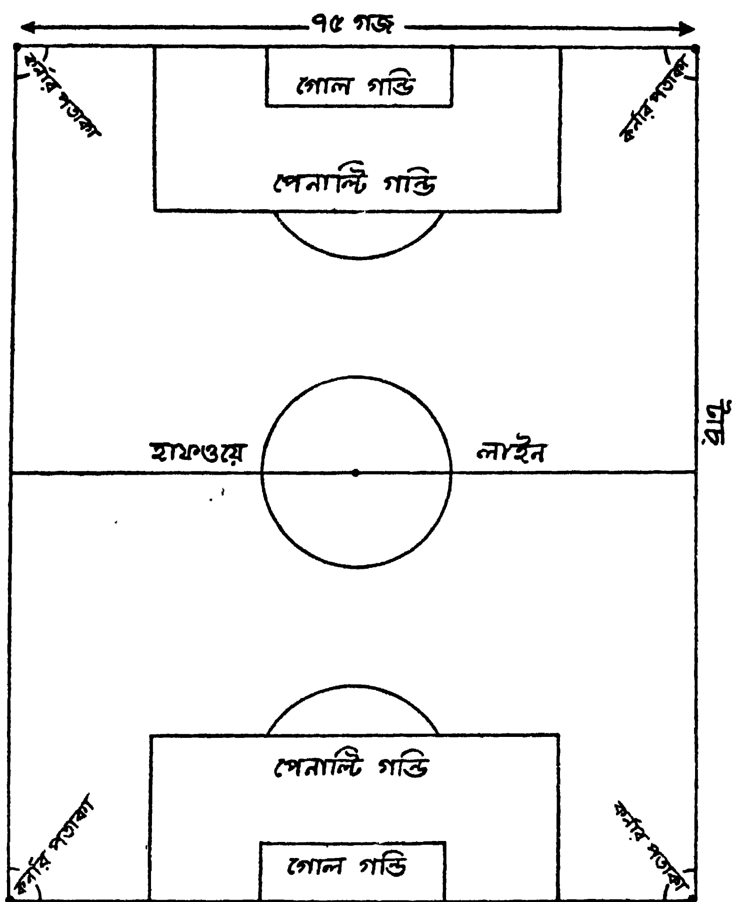
১নং নিয়ম—খেলার মাঠ

অয়াতন :

(১) খেলার মাঠ আয়তক্ষেত্র হওয়া চাই। লম্বায় ১০০ থেকে ১৫০ গজের বেশি নয়, চওড়ায় ১০০ গজের বেশি নয় অথবা ৫০ গজের কম নয়। [আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ১২০ গজের বেশি অথবা ১১০ গজের কম হবে না, চওড়ায়ও ৮০ গজের বেশি অথবা ৭০ গজের কম হবে না]।

তবে **সাধারণত ১১৫×৭৫ গজ আয়তনের মাঠই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।**

॥ খেলার মাঠ ও চিহ্ন ॥



ফুটবল মাঠের নকসা

হাফওয়ে লাইন, টাচ্-লাইন, এবং সেণ্টার-বৃত্ত এঁকে দেখাতে হবে ও মাঠের চারকোণে কর্ণার পতাকা পুঁততে হবে।

চিহ্ন :

(২) দীর্ঘতর সীমানা রেখাটিকে বলা হয় টাচ্-লাইন, ও ক্ষুদ্রতরটি হল গোল-লাইন। মাঠের মাঝখান বরাবর চিহ্নিত করা থাকবে 'হাফওয়ে লাইন' বা মধ্যরেখা। মাঠের কেন্দ্র বা সেণ্টার বোঝানো হবে একটা বোধগম্য চিহ্ন দ্বারা এবং তাকে ঘিরে ১০ গজ ব্যাসের এটা সেণ্টার-বৃত্ত আঁকা থাকবে।

গোল-গণ্ডি :

(৩) খেলার মাঠের উভয় গোলপ্রান্তে প্রত্যেক গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে দুটি রেখা টানতে হবে। রেখা দুটি মাঠের ভেতর ৬ গজ অবধি যাবে ও গোল-লাইনের সমান্তরাল একটি রেখা দ্বারা তাদের দুইপ্রান্ত যুক্ত হবে। এই রেখা ও গোল-লাইন দ্বারা সীমাবদ্ধ জায়গাকে বলা হয় গোল-গণ্ডি বা গোল-এলাকা।

পেনাল্টি-গণ্ডি :

(৪) খেলার মাঠের উভয় গোল-প্রান্তে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে প্রত্যেক গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ দূরত্বে দুটি রেখা টানতে হবে। রেখা দুটি মাঠের ভেতর ১৮ গজ অবধি যাবে ও গোল-লাইনের সমান্তরাল একটি রেখা দ্বারা তাদের দুই প্রান্ত যুক্ত হবে। এই রেখা ও গোল-লাইন দ্বারা সীমাবদ্ধ জায়গাকে বলা হয় পেনাল্টি-গণ্ডি। প্রত্যেক পেনাল্টি-গণ্ডির মধ্যে গোল-লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে ১২ গজ ভেতর একটা বোধগম্য চিহ্ন দিতে হবে। এ হল পেনাল্টি-কিকের চিহ্ন। প্রত্যেক পেনাল্টি কিক্-চিহ্ন থেকে ১০ গজ ব্যাসের একেকটি বৃত্তাংশ আঁকতে হবে পেনাল্টি-গণ্ডির বাইরের দিকে।

কর্নার-এলাকা :

(৫) প্রত্যেক কর্নার পতাকা থেকে ১ গজ ব্যাসের একেকটা বৃত্তাংশ (সিকি পরিমাণ) আঁকতে হবে খেলার মাঠের ভেতর দিকে।

গোল :

(৬) প্রত্যেক গোল লাইনের কেন্দ্রস্থলে থাকবে গোল। এর জন্য চাই দুটি সোজা খুঁটি (কর্নার পতাকা থেকে সমান দূরত্বে), মাঝখানে

৮ গজের ব্যবধান, দু'খুঁটির মাথায় আড়াআড়ি যুক্ত থাকবে ক্রসবার। মাটি থেকে তার নিম্ন প্রান্তের উচ্চতা হবে ৮ ফুট। গোল-পোস্ট ও ক্রসবারের কাঠ ৬ ইঞ্চির বেশি চওড়া বা পুরু হবে না।

গোলের পেছনে এমনভাবে নেট লাগাতে হবে যাতে গোলরক্ষকের নড়াচড়ার কোনো অসুবিধা না হয়।

২নং নিয়ম—বল

বল হওয়া চাই সুগোল আকৃতির। বাইরের আবরণ চামড়া ছাড়া আর কিছুর যেন না হয়। বলের পরিধি ২৮ ইঞ্চির বেশি অথবা ২৭ ইঞ্চির কম হবে না। খেলার শুরুতে বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশি অথবা ১৪ আউন্সের কম হবে না। বল বদল করতে হলে অবশ্যই রেফারীর অনুমোদন চাই।

৩নং নিয়ম—খেলোয়াড়ের সংখ্যা

দু'দলে খেলা হবে—কোনো দলেই এগারোজনের বেশি খেলোয়াড় থাকবে না। এদের মধ্যে একজন থাকবে গোলরক্ষক। ম্যাচের সময় অন্য খেলোয়াড়রাও গোলরক্ষকের সঙ্গে জায়গা বদল করতে পারেন, তবে আগে তা রেফারীকে জানাতে হবে।

শাস্তি ঃ যদি রেফারীকে পূর্বে না জানিয়ে খেলার মধ্যেই কোনো খেলোয়াড় গোলরক্ষক হয়ে যান ও পেনাল্টি-গণ্ডির মধ্যে হাত দিয়ে বল স্পর্শ করেন তাহলে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি-কিকের সুযোগ দেওয়া হবে।

৪নং নিয়ম—খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম

অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে এমন কোনো জিনিস কোনো খেলোয়াড় পরবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ খেলোয়াড়দের সাধারণ সাজ হল জার্সি অথবা শার্ট, ছোট ট্রাউজার, মোজা ও বুট। গোলকীপারের পোষাকের রঙ এমন হওয়া চাই যাতে তাঁকে অন্য খেলোয়াড়দের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

৫নং নিয়ম—রেফারী

প্রত্যেক খেলার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একজন রেফারী থাকবেন তদারকের জন্য।

তিনি: (১) খেলার নিয়মকানুন প্রয়োগ করবেন ও যে-কোনো বিসংবাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন।

(২) খেলার রেকর্ড রাখবেন, সময় নির্ধারণের কাজ করবেন এবং পুরো অথবা স্থিরীকৃত সময়ের মেয়াদ দান করবেন, আকস্মিক বিপদ অথবা অন্য কারণে সময় নষ্ট হয়ে থাকলে তার সবটুকুই তিনি এর সঙ্গে যোগ করবেন।

(৩) কোনো নিয়মভঙ্গ ঘটলে তিনি নিজের বিবেচনামতো খেলা বন্ধ রাখতে পারেন এবং প্রাকৃতিক কারণ, দর্শকদের বাধাদান অথবা অন্য কোনো কারণে খেলা থামানো প্রয়োজন বোধ করলে তিনি খেলা স্থগিত রাখতে অথবা শেষ করেও দিতে পারেন। এ অবস্থায় তিনি ছু'দিনের মধ্যে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করবেন।

(৪) খেলার মাঠে প্রবেশ করার পরেই তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে কোনো অন্যায় বা অভদ্র আচরণকারী খেলোয়াড়কে সাবধান করে দেবার এবং এর পরেও যদি সে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তিনি তাকে খেলায় অংশগ্রহণ করা থেকে সাস্পেণ্ড করতে পারেন। ঘটনার ছু'দিনের মধ্যে অপরাধী খেলোয়াড়টির নাম কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

(৫) খেলোয়াড় অথবা লাইনস্‌ম্যান ছাড়া আর কাউকে বিনা অনুমতিতে মাঠে প্রবেশ করতে দেবেন না।

(৬) কোনো খেলোয়াড় গুরুতর জখম হয়েছে মনে হলে তিনি খেলা বন্ধ রাখতে পারেন; মাঠ থেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই খেলোয়াড়কে স্থানান্তরিত করে তিনি খেলা পুনরারম্ভ করবেন। কোনো খেলোয়াড় সামান্য জখম হলে বল যতোক্ষণ না থামছে ততোক্ষণ খেলা বন্ধ করবেন না। জখম খেলোয়াড়ের যদি চিকিৎসার জন্য টাচ-লাইন অথবা গোল-লাইনের দিকে যাবার ক্ষমতা থাকে তাহলে আর তাকে খেলার মাঠে চিকিৎসা করার প্রয়োজন নেই।

(৭) মারমুখী মেজাজ বা আচরণের জন্য যে কোনো অপরাধী

খেলোয়াড়কে তিনি আগে, সতর্ক না করে দিয়েও ইচ্ছে করলে সাস্‌পেণ্ড করতে পারেন।

(৮) প্রত্যেক বিরতির পর খেলা নতুন করে আরম্ভ করার সময় সিগ্‌ন্যাল দেবেন।

(৯) খেলার বল ২নং নিয়ম অনুযায়ী ঠিক আছে কি না সেটা রেফারী দেখবেন।

৬নং নিয়ম—লাইনস্‌ম্যান

দু'জন লাইন্‌সম্যান নিয়োগ করতে হবে, যাদের কর্তব্য হবে (রেফারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) বল কখন 'খেলার বাইরে' (ক্রীড়া-বিরত) হল তা নির্ণয় করা ও কোন পক্ষ কর্নার কিক্, গোল-কিক্ অথবা থ্রো-ইনের সুযোগ পাবে তা নির্ণয় করা। নিয়মানুযায়ী খেলা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা রেফারীকে সাহায্য করবেন। লাইন্‌সম্যান অযথা বাগড়া দিলে অথবা অশোভন আচরণ করলে রেফারী তাঁকে বরখাস্ত করে নতুন লোক নিয়োগ করতে পারবেন। যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাব লাইন্‌সম্যানকে পতাকা দেবে।

৭নং নিয়ম—খেলার সময়

খেলার মেয়াদ হবে ৪৫ মিনিট হিসাবে দু'টো সমান পিরিয়ড বা পর্যায়ে (যদি না আগে থাকতে আপোসে কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করে রাখা হয়)। [আই এফ এর নিয়মানুযায়ী খেলার মেয়াদ পঁচিশ মিনিট হিসাবে দু'টো সমান পর্যায়ে বিভক্ত]। শর্ত থাকবে যাতে: (ক) আকস্মিক বিপদ বা অন্য কোনো কারণে সময় নষ্ট হয়ে থাকলে রেফারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা উভয় পিরিয়ডে যোগ করা হয়; (খ) যে-কোনো হাফে স্বাভাবিক সময়ের মেয়াদের পরেও পেনাল্টি কিকের জন্য প্রয়োজন হলে সময় বাড়াতে হবে।

হাফ-টাইমের বিরতি রেফারীর সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুতেই যেন পাঁচ মিনিটের বেশি না হয়।

৮নং নিয়ম—খেলার আরম্ভ

(১) খেলার শুরুতে মুদ্রার টস্ দ্বারা প্রান্তভাগ ও কিক্-অফ্ স্থির করতে হবে। যে দল টসে জিতবেন তাঁরাই প্রান্ত অথবা কিক্-অফ্ বাছাই করে নেবেন।

(২) একবার গোল হবার পরে খেলা নতুন করে শুরু হবে, পরাজিত দলের একজন খেলোয়াড় প্রথম কিক্-অফ্ করবেন।

(৩) হাফ টাইমের পর নতুনভাবে খেলা শুরু করবার সময় টিম দুটো প্রান্ত পরিবর্তন করবে। যে দল খেলা প্রথম শুরু করেছিল তার বিপক্ষ দল এবার কিক্-অফ শুরু করবেন।

(৪) সাময়িক স্থগিত-করণের পর নতুন করে খেলা শুরু করবার সময়—স্থগিত-করণের ঠিক আগের মুহূর্তে বল যদি টাচ লাইন অথবা গোল-লাইন পার হয়ে না থাকে, তাহলে খেলা স্থগিত-করণের সময় বল যেখানে ছিল সেইখানে রেফারী ড্রপ দেবেন। ড্রপ দেওয়া বল যতোক্ষণ না মাটি স্পর্শ করছে ততোক্ষণ কোনো খেলোয়াড় বল খেলতে পারবেন না।

৯নং নিয়ম—ক্রীড়ারত ও ক্রীড়াবিরত বল

বল ক্রীড়াবিরত হবে (খেলার বাইরে চলে যাবে) তখনই—

(১) যখন তা পুরোপুরি গোল-লাইন অথবা টাচ-লাইন পার হয়ে গেছে তা সে মাটির উপর দিয়েই হোক কি শূন্য দিয়েই হোক।

(২) রেফারী যখন খেলা বন্ধ করেছেন। আর সমস্ত সময় ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বল ক্রীড়ারতই থাকবে, এমন কি—

(৩) যদি তা গোলপোস্ট, ক্রস্‌বার, অথবা কর্নার পতাকা দণ্ডে লেগে মাঠের মধ্যে ফিরে আসে।

(৪) যদি রেফারী অথবা লাইন্‌সম্যানের দেহে ঘা খেয়ে সরে যায়।

(৫) যতোক্ষণ না নিয়মভঙ্গ ঘটেছে বলে বাস্তবিকই কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছে।

১০নং নিয়ম—গোল করার পদ্ধতি

নিয়মাবলীতে অন্য কোনরূপ বিশেষ শর্ত আরোপ করা না থাকলে—গোটা বলটা যখন গোল লাইন পার হয়ে দু'টো গোলপোস্ট ও ক্রস্‌বারের ভেতর দিয়ে চলে যায় তখনই গোল স্কোর করা হয়ে থাকে। তবে আক্রমণ-কারী দলের খেলোয়াড় বলটিকে হাত বা বাহু দ্বারা ছুঁড়ে অথবা বহন করে গোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলে গোল হবে না। খেলা চলার সময় যদি ক্রস্‌বার কোনো কারণে স্থানচ্যুত হয় এবং বল এমন জায়গা দিয়ে গোল

লাইন পার হয় রেফারীর মতে যেটা ক্রসবারের স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে নীচে—তা হলে তিনি গোল হয়েছে বলে জানিয়ে দিতে পারেন।

যে দল বেশি সংখ্যক গোল করবে তাদেরই জয়ী বলে ধরা হবে। যদি কোনো গোল না হয়, অথবা দু'পক্ষে সমান সংখ্যক গোল হয় তা হলে খেলা 'ড্র' হল বলে ধরা হবে।

১১নং নিয়ম—অফ্‌সাইড

কোনো খেলোয়াড়কে তখনই অফ্‌সাইড বলে ধরা হবে যখন তিনি খেলার সময় বলের তুলনায় বিপক্ষের গোল-লাইনের দিকে বেশি এগিয়ে গেছেন। তবে তিনি অফ্‌সাইড হবেন না যদি—

(১) নিজস্ব মাঠের অর্ধাংশের দিকেই তিনি থাকেন।

(২) যদি বিপক্ষের দু'জন খেলোয়াড় গোল-লাইনের দিকে তাঁর চেয়েও বেশি এগিয়ে থাকেন।

(৩) যদি বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় বলকে শেষবার স্পর্শ করে থাকেন অথবা বল খেলে থাকেন।

(৪) যদি তিনি গোল কিক্, কর্নার কিক, থ্রো-ইন অথবা রেফারী ড্রপ থেকে সরাসরি বল পেয়ে থাকেন।

শাস্তি :

অফ্‌সাইডের নিয়ম ভঙ্গ করলে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়কে নিয়মভঙ্গের ঘটনাস্থলটি থেকে পরোক্ষ ফ্রি-কিক্ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

অফ্‌সাইড অবস্থানের কোনো খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া যাবে না। যদি না রেফারীর অভিমত অনুসারে তিনি খেলার মধ্যে অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে থাকেন, কিংবা অফ্‌সাইড অবস্থানে থেকে কোনো রকম সুযোগ নেবার চেষ্টা করে থাকেন।

১২নং নিয়ম—ফাউল ও অশোভন আচরণ

১। যদি কোনো খেলোয়াড় নিম্নলিখিত ন'টি অপরাধের কোনো একটি করে থাকেন—

(ক) প্রতিপক্ষকে লাথি মারা অথবা মারতে চেষ্টা করা।

(খ) প্রতিপক্ষকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া, অর্থাৎ পেছন থেকে অথবা সামনে ঝুঁকে পড়ে অথবা পা দিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া অথবা দিতে চেষ্টা করা।

(গ) প্রতিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া।

(ঘ) মারমুখী বা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষকে চার্জ করা।

(ঙ) প্রতিপক্ষ বাধার সৃষ্টি করে না থাকলে তাকে পিছন থেকে চার্জ করা।

(চ) প্রতিপক্ষকে আঘাত করা অথবা আঘাতের চেষ্টা করা।

(ছ) হাত দিয়ে অথবা বাহুর কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা।

(জ) হাত দিয়ে অথবা বাহুর কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া।

(ঝ) বলে হাত দেওয়া অর্থাৎ হাত অথবা বাহু দিয়ে বল বহন করা, বলে আঘাত করা অথবা ঠেলে দেওয়া (পেনাল্টি-গণ্ডির মধ্যে ক্রীড়ারত গোলরক্ষক সম্পর্কে এ নিয়ম প্রয়োজ্য নয়)।

—তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধ-সংঘটনের জায়গা থেকে বিপক্ষ দলকে **সিধে ফ্রি-কিক্‌**, মারার সুযোগ দিয়ে।

আক্রান্ত দলের কোনো খেলোয়াড় পেনাল্টি-গণ্ডির মধ্যে ইচ্ছে করে যে কোনো একটা অপরাধ করলে তার শাস্তি হবে **পেনাল্টি কিক্‌**।

পেনাল্টি-গণ্ডির মধ্যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সময় বল যেখানেই থাক না কেন পেনাল্টি কিকের শাস্তি দেওয়া চলে।

২। নিম্নলিখিত পাঁচটি অপরাধের যে-কোনো একটি করলে খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধ-সংঘটনের স্থান থেকে বিপক্ষ দলকে ফ্রি-কিক্‌ করার সুযোগ দিয়ে:

(ক) এমনভাবে খেলা যা রেফারীর অভিমতে বিপজ্জনক, যেমন—গোলরক্ষকের হাতে বল থাকার সময় বলে কিক্‌ করতে চেষ্টা করা।

(খ) বল যখন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের খেলার আওতার মধ্যে নেই এবং তাঁরা স্থিরনিশ্চিতভাবে খেলার চেষ্টাও করেছেন না তখন তাঁদের চার্জ করা —যেমন কাঁধ দিয়ে চার্জ করা (নিয়ম মাফিক হলেও অসময়ে)।

(গ) বল খেলছেন না অথচ ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া

অর্থাৎ প্রতিপক্ষ ও বলের মাঝখানে ছুটে যাওয়া কিংবা প্রতিপক্ষকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে শরীর দিয়ে আড়াল করা।

(ঘ) গোলকীপার যখন—১। বল হাতে ধরে আছেন, ২। প্রতিপক্ষকে বাধা দিচ্ছেন, ৩। গোল এলাকার বাইরে চলে এসেছেন—তখন ছাড়া অন্য সময় তাঁকে চার্জ করা।

(ঙ) গোলকীপার হিসাবে খেলবার সময় বল বয়ে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ বল মাটিতে আছাড় না খাইয়ে হাতে নিয়ে চারপায়ের বেশি এগিয়ে যাওয়া।

৩। খেলোয়াড়কে তখনই 'সতর্ক' করে দেওয়া যাবে যদি--

(ক) খেলা শুরু হবার পর তিনি টিমে যোগ দেন অথবা খেলা চালু থাকা কালে তিনি মাঠে ফিরে আসেন রেফারীকে আগে না জানিয়ে অথবা খেলা থামবার জন্য অপেক্ষা না করে। (সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে খেলা বন্ধ করে থাকলে অপরাধ-সংঘটনের জায়গায় রেফারী বল 'ড্রপ' করে নতুনভাবে খেলা শুরু করাতে পারেন। কিন্তু খেলোয়াড় যদি আরো গুরুতর কোনো অপরাধ করে থাকেন তাহলে লঙ্ঘিত নিয়মে সেই ধারা অনুযায়ী তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে)।

(খ) যদি তিনি ক্রমাগত খেলার নিয়মাবলী ভঙ্গ করতে থাকেন।

(গ) কথা বা কাজে যদি তিনি রেফারীর সিদ্ধান্তে অবহেলা করেন।

(ঘ) যদি অভদ্রোচিত আচরণের জন্য অপরাধী হন।

শেষোক্ত তিনিটি অপরাধে যে কোনো একটির ক্ষেত্রে সতর্কীকরণ ছাড়াও বিপক্ষদলকে ঘটনাস্থল থেকে পরোক্ষ ফ্রি-কিক্ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

৪। খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে—

(ক) যদি তিনি মারাত্মক আচরণ করে থাকেন, অর্থাৎ নোংরা বা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করেন, অথবা রেফারীর মতে গুরুতর 'ফাউল' করে খেলতে থাকেন।

(খ) সতর্কীকরণের পরেও যদি অন্যায় আচরণ চালিয়ে যান।

কোনো খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্য যদি খেলা বন্ধ রাখতে হয়, অথচ অপরাধী যদি কোনো নতুন নিয়মভঙ্গ না করে থাকেন তা হলে খেলা ফের শুরু করা হবে বিপক্ষদলকে ঘটনাস্থলে একটি পরোক্ষ ফ্রি-কিক্ করার সুযোগ দান করে।

১৩নং নিয়ম—ফ্রি-কিক্

ফ্রি-কিক্ দু'ধরনের হতে পারবে—"ডিরেকট্" বা "সিধে" (যে কিকের সাহায্যে অপরাধী দলের বিরুদ্ধে সরাসরি গোল করা যেতে পারে), এবং "ইন্‌ডিরেকট্" বা "পরোক্ষ" (যে কিকের সাহায্যে গোল করা চলবে না যদি-না 'কিক্'-কারী ব্যতীত আর কেউ গোলের মধ্যে পাস্ করে দেওয়ার আগে সেটাকে খেলে থাকেন অথবা স্পর্শ করে থাকেন)।

যখন "সিধে" অথবা "পরোক্ষ" ফ্রি-কিক্ নেওয়া হচ্ছে সে সময় বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় বলের ১০ গজের মধ্যে আসতে পারবেন না যদি না তিনি দুই গোল্‌পোস্টের মাঝে নিজস্ব গোল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিক্ দেওয়ার আগেই যদি বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড় বলের ১০ গজের মধ্যে এসে পড়েন তা হলে রেফারী যতোক্ষণ-না নিয়ম মাফিক কাজ হচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত কিক্ করা স্থগিত রাখবেন। বল যতোক্ষণ-না তার নিজস্ব পরিধির সমান দূরত্ব পার হয়ে যাচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত বলকে "ক্রীড়ারত" বলে ধরা হবে না। কিক্ দেবার সময় বল স্থির রাখতে হবে, কিক্ হয়ে যাবার পর "কিক্"-কারী বলটাকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পারবেন না যতোক্ষণ না অন্য কোনো খেলোয়াড় সেটাকে ছোঁন অথবা খেলেন। যে ক্ষেত্রে রক্ষণ-দলকে পেনাল্‌টি-গণ্ডির মধ্যে ফ্রি-কিকের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে গোলরক্ষক কিক্ করার উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে বল ধরতে পারবেন না; কিকের সময় বল সিধে পেনাল্‌টি-গণ্ডির পার করে দিতে হবে। নিয়মের এই অংশটি যদি প্রতিপালিত না হয় তা হলে নতুন করে কিক্ করতে হবে।

শাস্তি:

কিক্-কারী ফ্রি-কিক্ করার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করার আগে যদি নিজে দ্বিতীয়বার বল খেলেন তাহলে বিপক্ষের কোন খেলোয়াড় নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে ইনডিরেক্ট বা পরোক্ষ ফ্রি কিক্ করবেন।

১৪নং নিয়ম—পেনাল্‌টি-কিক্

পেনাল্‌টি-চিহ্ন থেকে পেনাল্‌টি-কিক্ মারতে হবে। কিকের সময় 'কিক্'-কারী খেলোয়াড় প্রতিরোধকারী গোলরক্ষক ছাড়া আর সমস্ত খেলোয়াড়কে খেলার মাঠের মধ্যে, অথচ পেনাল্‌টি-গণ্ডির বাইরে গিয়ে

দাঁড়াতে হবে—পেনাল্টি-চিহ্ন থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে। বিপক্ষের গোল-রক্ষক (পা স্থির রেখে) তাঁর নিজস্ব গোল লাইনে দুই গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়াবেন যতোক্ষণ না বলে কিক্ করা হয়। যিনি কিক্ করছেন তাঁকে সোজা সামনের দিকে কিক্ করতে হবে, অন্য কোনো খেলোয়াড় বল না ছোঁওয়া পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বার বল ধরবেন না। পেনাল্টি কিকে সিধে গোল করা যেতে পারে। পেনাল্টি কিক্ করার সময় অথবা হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর দুই গোলপোস্টের মাঝখানে প্রবেশ করার আগে যদি বল গোলরক্ষককে স্পর্শ করে তা হলেও গোল বাতিল হবে না। যদি প্রয়োজন হয় হাফ-টাইম বা ফুল টাইমের মেয়াদ বাড়িয়ে পেনাল্টি কিকের সুযোগ দিতে হবে।

১৫নং নিয়ম—থ্রো-ইন

যখন পুরো বলটা মাটির ওপর দিয়ে অথবা শূন্য দিয়ে টাচ-লাইন পেরিয়ে যায় তখন সেটাকে ফের মাঠের ভেতর ছুঁড়ে দিতে হবে যে জায়গায় পার হয়েছিল সেই জায়গা থেকে যে-কোনো দিকে। থ্রো করবেন যে দল শেষবার বল ছুঁড়েছিলেন তাদের বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়। বল ছুঁড়বার মুহূর্তটিতে খেলোয়াড়কে মাঠের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে, প্রত্যেক পায়ের অংশ বিশেষ হয় লাইনের ভেতর নয় বাইরে থাকবে, 'থ্রো'-কারীকে উভয় হাতই ব্যবহার করতে হবে, মাথার ওপর দিয়ে বল ছুঁড়তে হবে। বল ছোঁড়ার পর মুহূর্ত থেকেই বলকে ক্রীড়ারত বলে ধরতে হবে। কিন্তু অন্য কোনো খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করা পর্যন্ত 'থ্রো'-কারী দ্বিতীয়বার বল ধরতে পারবেন না। থ্রো-ইনের বলে সোজা গোল দেওয়া যায় না।

শাস্তি ঃ

(ক) বল ঠিকমতো থ্রো করা না হলে প্রতিপক্ষের আরেকজন খেলোয়াড় থ্রো-ইনের সুযোগ পাবেন।

(খ) থ্রো করার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করার আগে যদি থ্রো-কারীই ফের বল ধরেন তা হলে নিয়মভঙ্গের ঘটনাস্থলে থেকে বিপক্ষ দলকে একটি পরোক্ষ ফ্রি-কিক্ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

১৬নং নিয়ম—গোল কিক্

আক্রমণকারী টিমের পা থেকে বল যখন দুই গোলপোস্টের মাঝখানের অংশ বাদ দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় গোল-লাইন পুরোপুরি পার হয়ে যায় তখন তাকে পেনাল্‌টি-গণ্ডি ডিঙিয়ে সরাসরি খেলার মাঠে কিক্ করে দিতে হবে—কিক্ করা হবে গোল-গণ্ডির সেই অর্ধাংশের মধ্যবর্তী একটি বিন্দু থেকে যেটা লঙ্ঘিত গোল-লাইনের নিকটতম অর্ধাংশ। কিক্ করবেন আক্রান্ত দলের একজন খেলোয়াড়। গোল-কিকের বল যেন কোনক্রমেই গোলকীপার হাত দিয়ে না ধরেন। বল যদি পেনাল্‌টি-গণ্ডি পার করে অর্থাৎ সরাসরি খেলার মধ্যে কিক্ করা না হয়, তাহলে আবার নতুন কিক্ করতে হবে। যতোক্ষণ না অন্য কোনো খেলোয়াড় বল খেলেন বা স্পর্শ করেন ততোক্ষণ পর্যন্ত 'কিক্'-কারী খেলোয়াড় দ্বিতীয়বার বল ধরবেন না। এরকম কিক্ থেকে সরাসরি গোল গ্রাহ্য হয় না। যে টিমের খেলোয়াড় গোল-কিক্ করছেন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের খেলোয়াড়রা কিকের সময় পেনাল্‌টি-গণ্ডির বাইরে থাকবেন।

শাস্তি ঃ

পেনাল্‌টি-গণ্ডি পেরিয়ে যাবার পর গোল-কিক্‌কারী খেলোয়াড় যদি অন্য খেলোয়াড়রা বল ছোঁবার আগেই দ্বিতীয়বার বল ধরেন, তাহলে বিপক্ষকে নিয়মভঙ্গের স্থান থেকে একটি পরোক্ষ ফ্রি-কিকের সুযোগ দেওয়া হবে।

১৭নং নিয়ম—কর্নার কিক্

আক্রান্ত দলের পা থেকে বল যখন দুই গোলপোস্টের মধ্যবর্তী অংশ বাদ দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় লাইন পেরিয়ে যায় তখন আক্রমণকারী টিমের একজন খেলোয়াড় নিকটতম কর্নার-পতাকাদণ্ডের বৃত্তাংশ থেকে বল কিক্ করবেন, অর্থাৎ কর্নার কিক্। এরকম কিকে সরাসরি গোল করা যেতে পারে। কর্নার কিকের সময় বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা বলের ১০ গজের মধ্যে আসতে পারবেন না যতোক্ষণ না বলটা 'ক্রীড়ারত' হয় অর্থাৎ বলের নিজস্ব পরিধির সমপরিমাণ জমি পার হয়ে আসে। অন্য

কোনো খেলোয়াড় বল ছোঁবার আগে যেন কর্নার কিক্-কারী দ্বিতীয়বার বল না ধরেন।

শাস্তি ঃ

এই নিয়মভঙ্গ করা হলে নিয়মভঙ্গের স্থান থেকে বিপক্ষদলকে একটি পরোক্ষ ফ্রি-কিকের সুযোগ দেওয়া হবে।

॥ এই বই সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ॥

● "এই পুস্তকখানি পাঠে কেবল যে ফুটবল খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার পথের সন্ধান পাইবেন তাহা নহে, খেলার পরিচালকগণ বা রেফারীগণও তাঁহাদের কর্তব্যকর্মের যথেষ্ট কিছু সহায়তা ও নির্দেশ লাভ করিবেন। ইহার বহুল প্রচারে বাঙ্গলার তথা ভারতীয় ফুটবলের ও রেফারিংএর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

● "বই-এর বিভিন্ন অংশে তত্ত্বগত শিক্ষা, খেলার কায়দা কৌশল, শিক্ষার কর্মসূচী এবং বিশেষ করে 'ভারতীয় ফুটবল এসো:'র অনুমোদিত আন্তর্জাতিক খেলার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হওয়াতে ফুটবল শিক্ষার্থী ও দর্শক মাত্রের পক্ষেই এই বইখানি বিশেষভাবে উপযোগী হয়েছে।"

—যুগান্তর

● "বাংলা ভাষায় খেলাধূলা সংক্রান্ত বই-এর সংখ্যা খুবই অল্প। সম্প্রতি যে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে "ফুটবলের কলাকৌশল" অন্যতম ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বাংলা দেশে সর্বজনপ্রিয় খেলা হোল ফুটবল এবং সেই খেলা যাতে বাঙ্গালী ছেলেরা ভালোভাবে শেখে তার জন্যেই এই বই প্রকাশ করা। নিঃসন্দেহে এই বই বাঙ্গালী ছেলেদের একটা বিরাট অভাব পূরণ করবে।"

—স্পোর্টস

● "কেবলমাত্র ক্রীড়ারসিক দর্শক নয় খেলোয়াড়রাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন, কারণ চিত্রের সাহায্যে খেলার প্রতিটি বস্তুই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আই এফ এর সর্বশেষ নিয়মাবলীও এতে আছে।"

—গড়ের মাঠ